182. Md. 897.5.

বঙ্কিমচন্দ্র

তৃতীয় ভাগ।

আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামের

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, সমালোচনা

ও

পরিশিষ্ট।

"তোমারি চরণ করিয়ে স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
তোমারি ভাবেতে দেখিন তোমায় ধরি এই মনোরথে॥"

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বি, এল,
প্রণীত।

কলিকাতা;
৩নং শত্রুঘ্ন ঘোষের লেন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮৯৭।

উৎসর্গ ও উপহার।

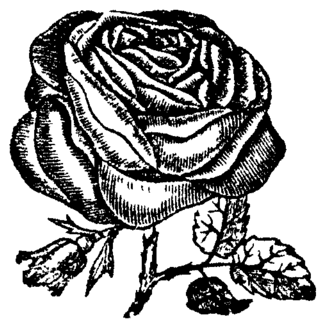

মহাকবি—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব চ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥"

ভগবানের এই উক্তি স্মরণ করিয়া তোমারই মহাগ্রন্থের টীকাস্বরূপ এই সামান্য গ্রন্থখানি, তোমাকেই উৎসর্গ করিয়া, তোমারই প্রীতিকামনায় তোমার উপন্যাসসমূহের পাঠকবৃন্দকে সাদরে উপহার প্রদান করিলাম।

অনুগত ভক্ত
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়ভাগ ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইল। ইহার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের শেষার্দ্ধ যেরূপ বিক্রীত হইয়াছে, তাহাতে এ ভাগ প্রকাশিত না হইবারই সম্ভাবনা অধিক ছিল। তাহাতে অবশ্য পাঠকবর্গের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কিন্তু আমার মনে একটা নিদারুণ কষ্ট থাকিয়া যাইত। সেই কষ্ট নিবারণ জন্য পৈত্রিক অর্থ ব্যয় করিয়া এই খণ্ড পাঠকবৃন্দ-সমীপে উপস্থিত করিলাম।

পুস্তক ত প্রকাশিত হইল, কিন্তু এ ছাই পাঁশ পড়িবে কে? যাঁহার নামে পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তিনি জীবিত থাকিলে, ভক্তের প্রতি দয়াবশতঃও এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তাঁহাকে পড়িতে হইত এবং তাহাতেই এ অধমও পরম কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইতে পারিত। এখন তিনি জীবিত নাই, তাই ভাবিতেছি, এ ভস্ম কে আর স্পর্শ করিতে চাহিবে—কে আর আমার আব-দার রক্ষা করিতে এ কষ্ট স্বীকার করিবে?

অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমার এ গ্রন্থে আমার এমন কিছুই নাই, যাহা মূল্য গ্রহণ করিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারি। সেই জন্যই অপরেও বোধ হয় ইহা অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহে। তাই এই সংস্করণ সম্বন্ধে এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলাম। পুস্তক কিনিয়া পড়িতে, অর্থব্যয় ও সময়ব্যয় দুইই হইয়া থাকে। আমি পাঠকগণের প্রথম ব্যয়টি বাঁচাইলাম—শেষের ব্যয়টাও তাঁহাদের ইচ্ছাধীন করিলাম। বিজ্ঞাপন দেখিয়া পুস্তক কিনিলে অনিচ্ছাবশতঃও সময় ব্যয় করিতে

হইত। এ স্থলে সময় ব্যয় করা না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাঠকবৃন্দেরই রহিল।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথমার্দ্ধ—যাহাতে বিষবৃক্ষ, রজনী প্রভৃতি উপন্যাসের বিশ্লেষণাদি থাকিবে, তাহা প্রকাশ করিতে পারি কি না সন্দেহ। তবে যদি এখনকার মত পুস্তক প্রকাশ করিতে নিতান্তই আগ্রহ হইয়া পড়ে, তবে তাহাও প্রকাশিত হইতে পারে। অধুনা পাঠকবৃন্দের সে কষ্টের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩০৩। } বিনীত গ্রন্থকারস্য।

বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় ভাগ।

আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম।

চরিত্র-বিশ্লেষণ—ব্যাখ্যা—সমালোচনা।

(১) সত্যানন্দ।

"আনন্দ-মঠ" এর সন্ন্যাসী সত্যানন্দ মহাকবির একটি অ
অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এরূপ স্বদেশানুরাগী সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মবীর জগতে
অন্য কোন কাব্যে কল্পিত হইয়াছে কি না, জানিনা। পরাধীন প
পদদলিত বঙ্গদেশের এ বিরাট কল্পনা, অন্যান্য স্বাধীন সাম্রাজ্যে
সমধিক আদর ও গৌরবের জিনিস। যে বলে, বাঙ্গালী এখন
স্বদেশভক্তি শিখিতে পারে নাই, তাহাকে আমরা কবি ব
চন্দ্রের এই অলৌকিক সৃষ্টি অবলোকন করিতে অনুরোধ ক

সত্যানন্দের ন্যায় স্বদেশভক্ত যিনি সৃজন করিতে সক্ষম, তাঁহাকে কি স্বদেশভক্ত বলিতে পারিব না?

এই সত্যানন্দ-চরিত্র অতি বিচিত্র। ইহা যেমন মহান্ তেমনই মনোহর, যেমন পরিষ্কার, তেমনই প্রচ্ছন্ন; যেমন ভাবময়, তেমনই জ্ঞানপূর্ণ। এইরূপ চরিত্রের ধারণা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমরা তাহা পাঠকবর্গ সহিত এখন দেখিতে চেষ্টা করিব।

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্র শূন্য, এইরূপ পল্লবের অনন্তসমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, বনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশু-পক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

"একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

"পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।"

দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় ভয়ে, বিস্ময়ে, করুণায়, নিরাশায় আকুল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে গ্রন্থকারের সহিত কয়েক অধ্যায় উত্তীর্ণ হইলাম। ক্রমে কৌতূহলের পর কৌতূহল জন্মিতে লাগিল—শেষে দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে সব জানিতে পারিলাম।

জানিলাম—সত্যানন্দের ব্রত, ঐ স্বদেশোদ্ধার। তখন সেই অরণ্য বুঝিলাম, অন্ধকার বুঝিলাম;—সেই নিস্তব্ধতা বুঝিলাম, সেই নিশীথ বুঝিলাম; সেই শ্মশান বুঝিলাম, সেই সাধনা বুঝিলাম; ফোঁটায় ফোঁটায় চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল।

দেখিলাম, অত্যাচার-প্রপীড়িত মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য, সত্যানন্দ সাধনা করিতেছেন। তিনি এখন সেই জন্য সর্ব্বত্যাগী—মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সত্যানন্দের কিছুই নাই—বা ইহাদের কাহারও সহিত তাঁহার আর সম্বন্ধ নাই। একমাত্র ঐ স্বদেশোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী হইয়াছেন। দেখিলাম, শুভ্রকায়, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি সত্যানন্দ একাকী—অসহায়। ধন নাই, জন নাই, রাজ্য নাই, সম্পদ্ নাই, সেই তাঁহার অন্তরের আরাধ্যা হইতে আরাধ্যাতর মাতৃভূমির জন্য সাগরে বালির বাঁধ বাঁধিতেছেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া মহাপুরুষ বোধে শরীর কণ্টকিত হইল। কিন্তু তাঁহাকে এ অসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ হইল। বাঙ্গালী ভিক্ষুক সত্যানন্দের এমন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা! কোথায় মুসলমান শাসনকর্ত্তা—তাঁহার সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, সুশিক্ষিত সেনমণ্ডলী,—কোথায় এই একা, নিরস্ত্র, অসহায়, ব্রহ্মচারী! তাঁহা

সেই আকৃতিতেও তৎপ্রতি আমাদিগের ভক্তি স্থির রাখিতে পারিল না। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী সত্যানন্দ বিষম বিকারগ্রস্ত। পাগলের কার্য্য দেখিতে সকলেরই মন উৎসুক হইয়া থাকে, আমরা তাই সোৎসাহে সত্যানন্দের সেই কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে অন্যের অগম্য প্রদেশে সত্যানন্দ সন্ন্যাসী স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য একটি বিরাট ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজ কবি-কল্পিত আর্থরের বীর-সম্প্রদায়ের (Knights of the Round table) ন্যায় তাঁহার চতুস্পার্শে এক বীরসম্প্রদায় বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদের নাম সন্তান-সম্প্রদায়। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, মায়াত্যাগী, ব্রহ্মচারী। ইহাদিগের অন্য কর্ম্ম নাই, অন্য প্রভু নাই, অন্য দেবতা নাই—মাতৃভূমিই ইহাদিগের সব। হারা সেই মাতৃভূমির মাতৃভক্ত সন্তান। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ হাদিগের মহাপ্রভু। ইহারা প্রায় সকলেই এই মহাপ্রভুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—যে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, বাড়ী, ঘর, কিছুরই সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। এ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত,—মৃত্যু। দেখিলাম, এ সন্তানগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সেই জনহীন কাননটিকে এখন দুর্জ্জয় দুর্গে পরিণত করিয়াছে; চতুর্দ্দিক হইতে ধনরত্নাদি আহরণ করিয়া, সেই দুর্গের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছে। দেখিলাম, সন্তানগণ সকলেই পণ্ডিত—সকলেই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত। দেখিলাম, ইহারা বিপন্নের বন্ধু, ত্যাচারীর সাক্ষাৎ শমন। ইহাদের সকলই অপূর্ব্ব—ইহাদের র্গ অপূর্ব্ব, ইহাদিগের ধর্ম্ম অপূর্ব্ব। ইহাদের নাম অপূর্ব্ব,

ইহাদিগের কার্য্য অপূর্ব্ব, সঙ্গীতও অপূর্ব্ব! আনন্দমঠ, ইঁহাদিগের ধর্ম্ম, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ ইহাদিগের নাম, যুদ্ধ ইহাদিগের মাতৃসেবা, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' ইঁহাদিগের সঙ্গীত!

কি বিরাট ব্যাপার! কি সুন্দর সম্মিলন! বাঙ্গালী সত্যানন্দ একাকী এতটা কাণ্ড করিল! কিরূপে করিল, জানিতে বড় কৌতূহল হইল। যে বাঙ্গালী ঘরে উপবাস করিয়া মরিতেও স্বীকার, তবু স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে না, সেই বাঙ্গালী স্ত্রীপুত্রের মায়া ত্যাগ করিয়াছে! যে বাঙ্গালী নিজের প্রতি অত্যাচারে বাঙ্‌নিস্পত্তি করিতে পারে না, সেই বাঙ্গালী পরের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া অস্ত্র ধারণ করিতেছে! যে বাঙ্গালী দুই জনে একত্র থাকিলে ঝগড়া করে, সেই বাঙ্গালী এত লোক একত্র সমবেত হইয়াছে! সত্যানন্দ তবে কি কোন মন্ত্র জানেন? এমন অভাবনীয় সংঘটন করা কি মানবের সাধ্যায়ত্ত—সত্যানন্দ তবে কি দেবতা?

কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার বিলোকন করিতে লাগিলাম—আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভাবিতে লাগিলাম। ইতিহাসের অনেক কথা মনে হইল—ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি মনে হইল—কিন্তু এ সত্যানন্দ সমীপে তাহারা কেহ দাঁড়াইতে সাহস পাইল না। ভাবগাম্ভীর্য্যে হৃদয় প্রপূরিত হইল—মনে মনে সত্যানন্দের স্রষ্টাকে শত শত প্রণাম করিলাম। হায় মা, কবে আর তোমার এমন সন্তান হইবে?

কিরূপে এমন হইল—কিরূপে সত্যানন্দ একা এতটা কাণ্ড করিতে পারিলেন, অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধান করিতে করিতে সব দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া

দেখিয়া, যাহা অতি বিস্ময়কর বিবেচিত হইয়াছিল, তাহ অতি সাধারণ মনে হইল। যাহা অসম্ভাব্য মনে হইয়াছিল তাহা স্বাভাবিক মনে হইল। মনে হইল, সত্যানন্দ যেরূপ করিয়া দলের লোক জুটাইয়াছেন, সেরূপ করিলে সর্ব্বত্র সকল সময়েই লোক জুটিতে পারে। সত্যানন্দের কৌশল দেখিয় বিস্মিত হইলাম—তাঁহার বুদ্ধি দেখিয়া মস্তক অবনত হইল কোথায় ইহার কাছে বিস্‌মার্কের বুদ্ধি! যেখানে ভক্তির প্রাবল্য সেইখানেই বুঝি কেবলমাত্র ভক্তি-সাধনের এমনই উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

একদিন দেখিতে পাইলাম, অত্যাচার-প্রপীড়িত দুর্ভিক্ষ-গ্রাসিত পদচিহ্ন গ্রাম হইতে মহেন্দ্রলাল সিংহ নামক একজন ধনবান জমিদার সস্ত্রীক নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে মহেন্দ্র সিংহের পত্নী দুর্ভিক্ষ-প্রণোদিত দস্যু হস্তে পড়িলেন—সত্যানন্দ ঠাকুর তাঁহার উদ্ধার করিলেন। শোকে দুঃখে মহেন্দ্র সিংহ পত্নীর অন্বেষণে বনে গমন করিতেছিলেন, পথে মুসলমানের সিপাহী তাঁহাকে নিরর্থক কারাবদ্ধ করিল। সন্তান ভবানন্দ মহেন্দ্রের সাধন করিলেন। উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকে 'আনন্দমঠে' প্রভু সত্যানন্দের নিকট আনয়ন করিলেন। পথে ভবানন্দের সহিত মহেন্দ্রের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহেন্দ্র এইখানেই সন্তান সম্প্রদায়ের কিছু পরিচয় পাইলেন—অন্ততঃ তাঁহাদের অপূর্ব্ব মাতৃস্তবের মধুর রস তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল।

এইরূপ অবস্থায় ভবানন্দ মহেন্দ্রকে সত্যানন্দ-সমীপে উপস্থিত করিলেন।

মহেন্দ্র সত্যানন্দের সমীপে উপস্থিত হইলেন, "সত্যানন্দ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে কহিলেন—'বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।' এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর বৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন,—'চল তাহারা যেখানে আছে তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।'"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, "অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণ-প্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরক-খচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তভশোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শন চক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত, মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটী প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি, রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন; দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্য-যন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগরাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুরত্ন-মণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর,

অতি ভীতস্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সকল দেখিতে পাইতেছ?' মহেন্দ্র বলিলেন,—'পাইতেছি।'

ব্রহ্ম। উপরে কি আছে, দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি, কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'আমরা যাঁর সন্তান!'

মহে। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল,—'বন্দে মাতরং।' এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, সর্ব্বাবরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইনি কে?'

ব্রহ্ম। মা—যা' ছিলেন।

মহে। সে কি?

ব্রহ্ম। ইনি কুঞ্জরকেশরী প্রভৃতি বন্যপশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাস-স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রী-রূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন,—'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক

অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,

'দেখ, মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, 'কালী।'

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাতে খেটক খর্পর কেন?'

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'এই পথে আইস।' এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিগ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'এই মা যা হইবেন! দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা'—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। 'দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-

পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা—বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।' তখন দুই জনে যুক্ত করে ঊর্দ্ধমুখে, এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,—

'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।'

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে। সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার স্ত্রী কন্যা কোথায় ?'

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে ?

মহে। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব ?")

দেখিয়া কতক কতক বুঝিলাম, কেন এত লোকে এ 'সন্তান'-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কতক দেশের অবস্থায় বাধ্য হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মবলে, কতক ভক্তবীর সত্যানন্দের অপূর্ব্ব প্রতিভা, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মবলে, এ 'সন্তান'সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। মহেন্দ্রের কথাটী পরীক্ষা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

মহেন্দ্রের স্বদেশ পরিত্যাগের কারণ, দুর্ভিক্ষ। রাজার অত্যাচারই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। মহেন্দ্র নির্ব্বোধ নহেন,

এ সকলই বুঝিয়াছিলেন। কাজেই রাজার উপরে তাঁহার একটু রাগ হইয়াছিল। সে রাজা মুসলমান—সুতরাং মুসলমান রাজারই দোষে রাজ্য এত বিশৃঙ্খল—এ অনুমান তাঁহার স্বতঃই হইল। এ সকল ধারণা কবি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া না দেখাইয় ইঙ্গিতে বলিলেন। মহেন্দ্রের মনে এ অসন্তোষের বীজ তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে রোপিত হইল। হইতে হইতে পথিমধ্যে আবার আর এক অত্যাচার মহেন্দ্রকে প্রপীড়িত করিল—দস্যুতে কল্যাণীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। ইহাও রাজার দোষে। রাজা দুষ্টের দমনে অক্ষম। ইহাতেও শেষ হইল না। মহেন্দ্র নিজে সেই মুসলমান রাজার সৈন্য কর্ত্তৃক বিনাদোষে আক্রান্ত হইলেন। এই সকল কার্য্যের ফলে—রাজার প্রতি মহেন্দ্রের বিরক্তি জন্মিল—বুঝি বা ঘৃণাও হইল।

রাজার প্রতি ঘৃণা হইলে, রাজবিদ্রোহীর প্রতি ঘৃণা দূর হয়। 'সন্তান'-সম্প্রদায় রাজার বিদ্রোহাচরণ বা ডাকাতি করিয়া সাধারণ ভালমানুষগণের বিরক্তিভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল ঘটনায় তাহাদের প্রতি মহেন্দ্রের বিরক্তি-ভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইল। তার পরে যখন মহেন্দ্র দেখিলেন, সন্তান ভবানন্দ তাঁহাকে সিপাহীর হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন, তখন উপকৃত হইয়া তৎপ্রতি তাঁহার কিছু অনুরাগ স্বভাবতঃই জন্মিল। কিন্তু তবু মহেন্দ্র শীঘ্র তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিলেন না—সে সব মহেন্দ্রের চরিত্রের ভাব অন্যত্র ব্যাখ্যা করিব। যাহাহউক, ভবানন্দের প্রতিই যখন মহেন্দ্রের ঈষৎ অনুরাগের উন্মেষ হইতেছিল, ভবানন্দ একে একে, আস্তে আস্তে, ধীর, মার্জ্জিত, সুললিত ভাষায় মহেন্দ্রকে রাজ্যের অবস্থা

বুঝাইয়া দিলেন। রাজার অত্যাচার, প্রজার কষ্ট, সবই বিশদ ভাষায় মহেন্দ্রের নিকট প্রকটিত হইল। মহেন্দ্র নিজেও তাহার কিছু অনুভব করিয়াছিলেন, কথাগুলি হৃদয়ে বড় লাগিল। তার পরে সম্মুখে ভবানন্দের সেই ভক্তিপূর্ণ মুর্ত্তি—সেই ভক্তিপ্রণোদিত সঙ্গীত, সেই ভক্তিপ্রচারিত উৎসাহ বাক্য, মহেন্দ্রকে অর্দ্ধেক 'সন্তান' করিয়া তুলিল। এখানেও কার্য্য শেষ হইল না। মহেন্দ্র শুনিলেন, সত্যানন্দ তাঁহার স্ত্রীকেও উদ্ধার করিয়াছেন—কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে, তাঁহার হৃদয় বিস্ফারিত হইল। কিন্তু এখনও তিনি 'সন্তান' ধর্ম্ম গ্রহণে নারাজ—কারণ তাহাতে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিতে হয়। শেষে যখন সত্যানন্দ তাঁহাকে প্রতিমারূপিণী সাকারা মাতৃভূমি দেখাইলেন, মহেন্দ্রের মতি ফিরিল; বলিলেন,—"আমি এ মন্ত্র গ্রহণ করিব।"

সত্যানন্দের সেই মূর্ত্তিস্থাপন—মূর্ত্তিপ্রদর্শন ও তাহার ব্যাখ্যাকথন তাঁহার এক অতি অদ্ভুত কৌশল। সত্যানন্দ জানিতেন, নিরাকারা মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি স্থাপন করিতে সকলে সক্ষম নহে। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদিগেরও সাকার দর্শনে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই—সত্যানন্দের ন্যায় ভক্তেরও এতদ্দর্শনে ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর যাহারা অক্ষম, তাহাদিগের ভক্তি-বিকাশের ইহা এক অমোঘ উপায়। ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্ম্মে যে কারণে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিল—একেশ্বরবাদ হইতে যে কারণে ভারতে তেত্রিশকোটী দেবতা কল্পিত ও পূজিত হইতে লাগিল, পরম ভক্ত, পরম প্রতিভাশালী সত্যানন্দও সেই কারণে মাতৃভূমির এইরূপ রূপপ্রদর্শন আবশ্যক ও ফলপ্রদ মনে করিলেন। তোমার শত-সহস্র উপদেশে, বক্তৃতায় শ্রোতার মনে

মাতৃভূমিসম্বন্ধে যে ধারণা না জন্মিবে—সত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত ঐ মূর্ত্তি দর্শনানন্তর তাঁহার দুই এক কথায় তাহার সে ধারণা জন্মিবে। তোমার ভাষা শব্দময়ী—সত্যানন্দের ভাষা রূপময়ী। কি সুন্দর অপূর্ব্ব ভাষা! মহেন্দ্র ত তাহা দেখিয়া ভুলিবেই—মহেন্দ্র সাধু পুরুষ—উহা দেখিয়া তোমার আমার মনও কি কিয়ৎকালের জন্য বিত্রস্ত হয় না?

কথিত আছে, ভক্তের জন্যই নিরাকার পরংব্রহ্মের রূপধারণ হইয়াছে। এ গভীর তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, সাধারণ ভক্ত রূপপূজা না করিয়া থাকিতে পারে না। ভক্ত সত্যানন্দ তাই আজ মনে মনে এ রূপ অধিষ্ঠিত রাখিয়া সন্তোষ লাভ না করায়, এ অদ্ভুত মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিস্থাপন সত্যানন্দের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তি প্রণোদিত বটে—আবার এই মূর্ত্তিস্থাপন তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যের অদ্ভুত সহায়ও বটে। যে মহেন্দ্র কিছুতেই স্ত্রী কন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহিল না, সেই মহেন্দ্র সেই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—"আমি এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইব।"

হায় বঙ্গমাতা—তোমার বক্ষদেশে ভগবানের এত মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, কিন্তু এ মূর্ত্তি বিরাজিত নাই কেন? বাঙ্গালী তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করে, এ দেবীর পূজা করে না কেন?

বাঙ্গালী চিরদিনই ধর্ম্মভীরু। যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য তাহারা ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া সহজে মনে করিতে পারে না। ইহাতে তাহাদিগের অপরাধ নাই। কৃষ্ণবন্ধু পরম বীর পার্থও একদিন যখন ইহাকে অধর্ম্ম্য কার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তখন হীনবুদ্ধি, হীনবীর্য্য বাঙ্গা-

লীর মনে ইহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেই ত। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে পরমপণ্ডিত পাণ্ডবকে নীতিশাস্ত্র বুঝাইয়া সাংখ্যজ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সত্যানন্দও সেইরূপ অনন্যগতি হইয়া এই দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি সঞ্চার দ্বারা হীনবীর্য্য বাঙ্গালীকে দেবীবিরোধী প্রতি অস্ত্র গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ভক্তিসুরা পান না করিলে, বাঙ্গালী নৃশংস কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না। তাই ভক্ত সত্যানন্দ এই ভক্তিপ্রতিমা স্থাপন করিয়া দিন দিন ইহার সেবক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আমরা সন্তানসম্প্রদায়ের পরিবৃদ্ধির কারণ দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র কেন, আমাদিগের ন্যায় পাষণ্ডগণও সেইরূপ সত্যানন্দের সেইরূপ আনন্দমঠে সেইরূপ মূর্ত্তি দেখিলে, 'সন্তান' না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে এই সন্তানধর্ম্ম কি, জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। ভাবিলাম, শুনিয়াছি এই মহেন্দ্র দীক্ষিত হইবে, সেই দিন সব বুঝিতে পারিব। সে দিন আসিল।

"সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন,

'তোমার কন্যা জীবিত আছে।'

মহে। কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন ?

মহে। সকলেই বলে তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ !

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ!

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, ততদিন, তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুঁড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তান মাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুটের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি সড়কীওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

সত্য। (সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই

লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ, দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার, কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া, পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধু-কৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে, তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবী উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত-শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। সে ঐ রকম কথা সকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়, তোমরা যিশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথায় আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি,—তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা

যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান্ শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়,—সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম, সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।"

এ অদ্ভুত দীক্ষার তাৎপর্য্য স্বয়ং সত্যানন্দ ঠাকুরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনন্তকার্য্য, অনন্যমনা, সর্ব্বত্যাগী না হইয়া এ ব্রত উদযাপন করিতে কেহ সমর্থ নহে। তাই পরম প্রতিভা-শালী প্রজ্ঞাচক্ষু সত্যানন্দ সেই সন্তানসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইতেন। সকলকে নহে—সকলে ইহা পালন করিতে সক্ষম নহে—তাই দলের অন্য লোকের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ কূটবুদ্ধিতে কোন রাজা-নৈতিক অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

আমরা এতক্ষণ সত্যানন্দের সাধনা ও কার্য্য দেখিয়াছি। এখন তাঁহার সেই সাধনা ও কার্য্যের ফলাফল দেখিব। ফল না দেখিয়া কার্য্যের ভালমন্দ বিচার সকল সময়ে ঠিক হয় না।

সত্যানন্দের সংকল্প, স্বদেশোদ্ধার। অত্যাচারী মুসলমান হইতে স্বদেশকে রক্ষা করা—হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা ও স্বদেশে দেবভক্তি প্রচার করাই সত্যানন্দের একমাত্র ব্রত। ইহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—একমাত্র

হিন্দুরাজ্য স্থাপন ব্যতীত অন্য দুইটী সংকল্প সত্যানন্দের সিদ্ধ হই-য়াছে। তাঁহার অদ্ভুত কৌশলে ও ঐকান্তিকী চেষ্টায় মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইল, ও স্বদেশে দেশভক্তিরও স্ফুরণ হইল। সত্যা-নন্দের যেরূপ ব্রত, যেরূপ সাধনা, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সময়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থকার এরূপ সাধনার সম্যক্ ফল দেখাইতে অক্ষম হইলেন। কাহারও কাহারও মতে সত্যা-নন্দের সাধনার সম্যক্ সিদ্ধিই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন; কাহারও কাহারও মতে সেই সাধনা সময়োচিত যতটা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব গ্রন্থকার ফলে তাহাই দেখাইয়াছেন। সময় ও ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পন্থা ছাড়াইয়া কার্য্য করিলে, ঐকান্তিকী চেষ্টাযত্নও সফল হইবার নহে।)

এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি এইরূপ। গ্রন্থকার চিকিৎসকের মুখে বলিতেছেন,—

"সত্যানন্দ! কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যু-বৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরাজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে। সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক; কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক

ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্ত-র্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহি-র্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া, অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।

("ইংরেজ এক্ষণে বণিক—অর্থ সংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।")

এই কথাগুলি লইয়া দুইদলের বড়ই মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কথাগুলি সরল ভাবেই লিখিত হউক, কি কপট ভাবেই লিখিত হউক, অতি গুরুতর সন্দেহ নাই। হয় ইহাতে গ্রন্থকারের সমগ্র গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য লিখিত আছে, নতুবা ইহাতে গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য গোপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে ভাবেই দেখা যায়, কথাগুলি গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এ ন্ধে মতদ্বয়ের অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত উক্তি না উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হতে পারিলাম না।

একদল বলেন, গ্রন্থকার রাজকর্ম্মচারী—রাজা ইংরাজ। স্ত গ্রন্থে রাজবিদ্রোহ ও স্বদেশোদ্ধারের কথাই লিখিত হই- ছে। পাছে ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছু মনে করেন, এই জন্য কার সত্যানন্দের সাধনার এইরূপই সিদ্ধি দেখাইয়াছেন . ংরাজ-রাজত্বের এই জন্যই আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পিচ, গ্রন্থে যখন ইতিহাসের ছায়া আছে, তখন ইংরাজের সঙ্গে ত্যানন্দের বিরোধ দেখাইতে হইলে, সত্যানন্দের জয় দেখান যায় া। এইজন্য একেবারে ইংরাজকে টানিয়া না আনিয়া, আংশিক াহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়াছেন। আনিয়া, সন্তান-সম্প্রদা- র হস্তে তাহাদিগের পরাজয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস জায় রাখিয়া এতদপেক্ষা সত্যানন্দের সিদ্ধি প্রদর্শন অসম্ভব। হিস্তত্ত্ব, অন্তস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা কেবল বাগাড়ম্বর বক্তৃতামাত্র। স্থখানির স্থূল তত্ত্ব এই যে স্বদেশোদ্ধার করিতে হইলে, সত্যান- ন্দের ন্যায় সাধনা চাই। এইরূপ সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য্য। ধন নাই, জন নাই, অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, ইহা কোন কাজের কথা নহে। অধ্যবসায় ও হৃদয়ের বল থাকিলে, অন্য সব গুলিই করা-

যত্ত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত কায়মনে, ভক্তিভরে, দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত, সাধু ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, সাধুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, তাহার সিদ্ধি অপ্রতিহার্য্য। সত্যানন্দের সাধনার সম্যক্ সিদ্ধিই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। তবে কতক ইতিহাসের, কতক রাজশাসনের ভয়ে, তাঁহাকে মনোভাব গোপন করিবার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সত্যানন্দের যুদ্ধে জয় পর্য্যন্ত তোমরা মনে রাখ; পরের কথায় ভুলিও না। উহা গ্রন্থকা মনের কথা নহে।

অন্য দল বলেন,—ইহা ঠিক নহে। রাজভয়ে গ্রন্থকা মনোভাব স্থানে স্থানে গোপন করিতে হইয়াছে বলিয়া, এর গুরুতর স্থানে মনোভাব গোপনের পাত্র তিনি নহেন। যাহা লোকের মনে বিপরীত ভ্রান্তির সম্ভাবনা, তাহাতে গ্রন্থক, কে দিনও হস্তক্ষেপ করেন না। বাস্তবিক কথা এই—

সকল বিষয়েরই ক্রমবিকাশ আছে। অঙ্কুর হইতে একেবারে বৃহৎ বৃক্ষ সঞ্জাত হয় না—সেই বৃক্ষের বিকাশের স্তর আছে স্বদেশোদ্ধারই বল, ধর্ম্মোদ্ধারই বল, একবারে ধাঁ করিয়া তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথ লঙ্ঘন করিয়া চলিলে, সত্যানন্দের ন্যায় সাধকেরও সিদ্ধি অসম্ভব। সত্যান দেশভক্তিতে অন্ধ হইয়া চক্ষে যাহা দেখিতে পান নাই, চিকিৎসক তাহাই তাঁহাকে দেখাইলেন। সত্যানন্দের জ্ঞানের অভাব চিকিৎসক পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তবে গ্রন্থকার ইহা দেখাইয়াছেন যে, সত্যানন্দের ন্যায় সাধকের সাধনা যতটুকু পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইয়াছে। সত্যানন্দের আকাঙ্ক্ষা অসময়োচিত হইলেও, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার চেষ্টা

র্মবিগর্হিত হইলেও, মধ্যে মধ্যে এইরূপ লোক জন্মিলে দশের উপকার বই অপকার হয় না। ইহাতে অন্ততঃ সময়োচিত আকাঙ্ক্ষাটুকুও পূর্ণ হইতে পারে। কতটা সময়োচিত, কতটা সময়োচিত নহে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। সাধারণের পক্ষে সুদৃষ্টান্ত চাই।

উভয় পক্ষেরই কথা আমরা সংক্ষেপে বলিলাম। পাঠকগণ র ভালমন্দ বিচার করিয়া লইবেন। কথাটি অতি গুরুতর। নে কি, এই কথাগুলির উপরেই সমগ্র গ্রন্থখানি স্থাপিত।

সত্যানন্দের সাধনা ও ফল সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, তদবলম্বিত পায় সম্বন্ধেও সেইরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সে কথাটিও রুতর। আমরা তাহারও একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠক-র্গের সম্মুখে স্থাপিত করিলাম।

সত্যানন্দের কামনার সিদ্ধি সম্বন্ধে যাহাই হউক, দেখা গেল া, তাঁহার বহুযত্নসৃজিত অদ্ভুত সন্তানসম্প্রদায় পরিণামে একে-রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেই আর্থরের বীর-সম্প্রদায়ের ায় প্রধান প্রধান সন্তানগণ সত্যানন্দের সেই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা । করিতে পারিল না—বীর জীবানন্দ, ধীর ভবানন্দ সকলেই তিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিনষ্ট হইল। সত্যানন্দসৃজিত অপরা ন্তান অল্পদিবস মধ্যেই অন্যের অত্যাচার নিবারণ করিতে ়া নিজেরাই অত্যাচারী হইয়া উঠিল। তবে সত্যানন্দের এরূপ ন্থা কি প্রকৃষ্ট পন্থা নহে?

একদল বলেন যে, সত্যানন্দের অবলম্বিত পন্থা প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেই পারে না। সামাজিক নিয়মের বিপর্য্যয় সাধন করিয়া

অথবা স্বয়ং গ্রন্থকারের ভাষায় বলিতে গেলে 'সমাজ-বিপ্ল সংঘটন করাইয়া কোন প্রকার সুফল লাভ করা বড় দুরূহ। প্রথমতঃ দেখ, তিনি সন্তানগণকে যেরূপ প্রতিজ্ঞাব করাইয়া লইয়াছিলেন, সেই রূপ গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ক তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই। কারণ বিবাহিত ব্যক্তিবর্গকে— মায়াশীল ব্যক্তিবর্গকে, প্রতিজ্ঞা দ্বারা স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছি রাখিয়া—মায়ার বস্তু হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া, ে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ সুফল আশা যাইতে পারে না। তাই জীবানন্দ ও ভবানন্দ প্রভৃতির দ্বা সত্যানন্দের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না—সন্তানসম্প্রদায় এত যত্নস্পৃ হইলেও, স্বল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

দ্বিতীয়তঃ—সত্যানন্দের উদ্দেশ্য যতই উৎকৃষ্ট হউ তিনি তাহা সাধনার্থ অতি অপকৃষ্ট উপায় অবল করিয়াছিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করি অর্থার্জ্জন দ্বারা দেশোদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। চিকিৎস স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—এইরূপ অসৎকার্য্যের ফল নিখুঁ ভাল হইতেই পারে না। এই দস্যুতা শিখিয়া অদীক্ষি সন্তানগণ ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই শী তাহাদের অধঃপতন ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। যদি বল এরূপ না করিলে, তিনি অর্থ কোথায় পাইতেন? ইহার মাত্র উত্তর এই যে, যেরূপ উপায়ে তিনি জন পাইয়া২০ চেষ্টা করিলে সেইরূপ উপায়েই তিনি ধনও পাইতে পারিতেন তিনি সেরূপ চেষ্টা করেন নাই— তাই তাঁহার দোষে তাঁহার সম্যক অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিল না।

অপর দল বলেন যে, ঠিক তাহা নহে। একদিকে ভবানন্দের কথা দেখিলে যেরূপ প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা জন্মে, সেইরূপ মহেন্দ্রের কথা ভাবিলে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে ইচ্ছা হয় না কি?

মহেন্দ্র একদিন তাহার স্ত্রী কন্যার মায়ার জন্যই সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহে নাই। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে, তাহার স্ত্রী কন্যা বাঁচিয়া নাই, তখন সে একজন প্রকৃষ্ট সন্তান দাঁড়াইল। আর ভবানন্দের কথাতেই বা এমন কি সূচিত র? ভবানন্দের দ্বারা কি সত্যানন্দের কার্য্য হয় নাই? বলিবে? সেইদিন ভবানন্দ না থাকিলে—সত্যানন্দসৃষ্ট বানন্দ না থাকিলে, যুদ্ধে কি জয়লাভ হইত? তবে ভবানন্দ দ্ধে মরিল। তাহাতে ক্ষতি কি? এরূপ সম্প্রদায় কি চির-স্থায়ী থাকিতে পারে? ইহার উৎপত্তি সাময়িক কার্য্যসাধনের জন্য—চিরকালের জন্য নহে। ভবানন্দের ওরূপ প্রতিজ্ঞা না থাকিলে, তাঁহার কি ঐরূপ কার্য্য দেখিতে পাইতাম? ভবানন্দের মৃত্যু কি ভবানন্দের দুঃখসূচক পরিণাম? অন্যে যাহাই ভাবুক, আমরা এরূপ ভাবি না। সত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত প্রতিজ্ঞাই সকলের হৃদয়ে রক্ষিত শক্তি (Reserved energy) স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। যথাসময়ে তাহা কার্য্যকরী হইল। ভবানন্দের মৃত্যু দেখিয়া তোমরা সত্যানন্দের সৃষ্ট সন্তানসম্প্রদায়ের দোষ দিও না। সত্যানন্দ উহা দ্বারাই যতদূর সম্ভব কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিতেন। তবে ও কথা কেন?

কার্য্যের ফল না দেখিয়া এমনি দেখিলেও এইরূপই দেখিতে পাইবে। সাধারণতঃ স্ত্রীকন্যা প্রভৃতিই আমাদিগকে কর্ত্তব্য

কার্য্য হইতে বিরত রাখে। সত্যানন্দ তাহাই জানিতেন বলিয়া ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জীবানন্দের স্ত্রীর মত স্ত্রী থাকিলে, তাহার সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা সত্যানন্দের ইচ্ছা নহে। ইহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথাতেও কোন সার দেখা যায় না। যিনি অসৎ কার্য্যে ধন অপব্যয় করেন বা যিনি অর্থ সত্বেও তাহার সদ্ব্যয় না, করেন তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ আনিয়া সৎ কার্য্যে ব্যয় করিলে পাপ হয় না। তবে সমাজবিপ্লব ঘটে কিন্তু এ স্থলে তাহাও হইতেছে না। সত্যানন্দ সমাজ- নিবারণের জন্যই এই রূপ করিয়াছিলেন।

এখন পরম সাধক সন্ন্যাসী সত্যানন্দের জীবনী একবা পর্য্যালোচনা করা যাউক। যে যে কার্য্যই করুক না কে তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের একটা সংশ্রব না থাকিলে, সে কার্য্য প্রশং সার যোগ্য নহে। সত্যানন্দের কার্য্যের সহিত তবে ধর্ম্মে কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে। গ্রন্থকা গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন শ্লোকগুলির অনুবাদ এইরূপঃ—

"আর যাহারা মদেকহৃদয়ে আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যস্ত কর ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আ তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যেই এই মৃত্যুপূষিত সংসার-সাগ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অতএব তুমি আমাতে মন বুদ্ধি সমর্পণ কর। তাহা হইলে শরীরাবসানে আমাতে লীন হইবে। হে ধনঞ্জয়! অন্তঃকরণ আমাতে স্থির না হইলে

প্রথমতঃ অনুধ্যানরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর।"

সত্যানন্দ এরূপ করেন নাই, তবু তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানই করিতেছিলেন, আমরা এরূপ বলিতে বাধ্য। কারণ বলিতেছি।

ধর্ম্মানুষ্ঠান বহুপ্রকারেব আছে। এতন্মধ্য হইতে যে প্রকারে যাঁহার অভিরুচি হয়; তিনি সেই প্রকারের কার্য্য অবলম্বন করিয়া ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। রুচি ক্ষমতা অনুযায়ী কেহ বা সন্ন্যাসযোগ, কেহ বা কর্ম্মযোগ, হ বা অন্যবিধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তদ্বিহিত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন রিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদের সন্ন্যাসী ত্যানন্দ গীতোক্ত কর্ম্মযোগই স্বীয় মানসিক বৃত্তি ও ক্ষমতার নুযায়ী বিবেচনা করিয়া তৎপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই র্ম্মযোগ সম্বন্ধেও অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্য হইতে গবানের প্রীতিপ্রদ কার্য্য সম্পন্ন করাই সত্যানন্দের ধর্ম্ম।* ভগবানের প্রীতিপ্রদ কার্য্যের মধ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অন্যতম। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ এই শেষোক্ত কার্য্যই স্বীয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির করিলেন। তখন বোধ হয়, তাঁহার মনে হইল—দুষ্ট ত জগতে অনেক—অত্যাচারও জগতে বহুপ্রকারের, তবে ইহার কোন্ প্রকারের দুষ্টের কোন্ প্রকার অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে? এই প্রশ্ন

* পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পরেই আছে—"উহাতে অসক্ত হইলে আমার কর্ম্ম কর।"

হৃদয়ে উদিত হইবামাত্রই তাঁহার দেশের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেশে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; সত্যানন্দ দেখিলেন, এ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ, রাজার প্রজানুরাগের অভাব। রাজার প্রজানুরাগ নাই কেন, তাহাও বুঝিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না। রাজা বিদেশী—সত্যানন্দের দেশের লোকের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অসম্ভব। তবে স্বদেশী রাজা চাই। তাহা কিরূপে হইতে পারে? প্রতিষ্ঠিত রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দূর না করিলে সে ত রাজ্য ছাড়িবে না!—তবে তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করা চাই। কাহারা তাহা করিবে? যাহাদের এ সম্বন্ধে স্বার্থ আছে। সে কাহারা?—না সত্যানন্দের স্বীয় দেশবাসিগণ। তাহ তবে ইহা করে না কেন?—কারণ অনেক। তন্মধ্যে তাহাে স্বদেশভক্তির অভাবই প্রধান। তাই সন্ন্যাসীর জীবনের লক্ষ হইল—স্বদেশে দেশভক্তির উদ্দীপনা ও তদ্দ্বারা স্বদেশে দেশী রাজ্য স্থাপন করা। সত্যানন্দ দেখিলেন, কার্য্যটি গুরুতর—কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অনন্যকার্য্য হওয়া চাই; তাই তাঁহা একমাত্র ধর্ম্ম ও জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যই হইল—দেশভক্তি প্রচার ও দেশীয় রাজ্য স্থাপনা।

এই কার্য্য যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠেয় সিদ্ধান্ত হইল, তখন তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু কিরূপ প্রস্তুত হইয়া তিনি কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। আমরা এখন তাহাই দেখাইয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

প্রথম দেখিতে হইবে—এ কার্য্যে চাহি কি? একাকী অস-

হায় সত্যানন্দের এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহি কি? প্রশ্নটি গুরুতর—আমরা ইহার উত্তর করিতে প্রয়াসী রহিলাম।

সর্ব্বকার্য্যেই অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তাহা ছাড়িয়া দেওয়া, অথবা দুই তিন বা দশবার তাহা সম্পন্ন করিতে অপারগ হইলাম বলিয়াই তাহা পরিত্যাগ করা—কার্য্যের ফলপ্রাপ্তির একান্ত পরিপন্থী। আবার কার্য্য আরম্ভ করিলে শ্লথভাবে তাহা করিলেও চলিবে না। তাই কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমই চাই, একান্ত অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ইহা সম্যক্ বুঝিতেন; তাই তিনি প্রথমে নির্জ্জনে বনমধ্যে স্বকীয় মন সংযত করিয়া, স্বীয় কার্য্যোদ্ধারে কান্তিকচিত্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার অন্য ধর্ম্ম ছিল না, ন্য কর্ম্ম ছিল না।

সত্যানন্দের এ সাধনা বুঝি একমাত্র বালক ধ্রুবের সাধনার হিতই তুলনীয়। হরিচরণদর্শনাভিলাষে অজ্ঞান বালক, নিরক্ষর ধ্রুবানন্দেরও যেরূপ তপস্যা দেখিয়াছি, স্বদেশোদ্ধার অভিলাষে অর্থহীন, বলহীন, একা, নিঃসহায় সত্যানন্দের সাধনাও সেইরূপই দেখিলাম। ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপকেও ইহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়। প্রতাপের একদিন রাজ্য ছিল, ধন ছিল, বল ছিল—প্রতাপ কোন দিনও একবারে নিঃসহায় ছিলেন না—কিন্তু সত্যানন্দের সমস্তেরই অভাব। সত্যানন্দের ছিল কবল সুদৃঢ় মন ও কর্ম্মঠ শরীর। সত্যানন্দের সাধনা প্রতাপের সাধনা হইতেও উচ্চশ্রেণীর। এরূপ সাধনা অন্যরূপে দেখিয়াছি—কূটবুদ্ধি খল চাণক্যের। যে চাণক্য পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগৎ হইতে বিলুপ্ত করণাভিলাষে এক একটি

করিয়া তুলিয়া তন্মূলে তক্র ঢালিতে ছিলেন, সেই চাণক্যের সহিতই অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতায় সত্যানন্দ তুলনীয়। ধ্রুবের কার্য্য ছিল না—ইঁহাদের কার্য্য ছিল।

এই অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা বজায় রাখিতে হৃদয়ের আর একটি বল চাই—হৃদয় ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া চাই। তোমার এখন যতই কেন অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা দেখা যাউক না কেন, তুমি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে শিখিয়া না থাকিলে, আমি উহাদের চিরাস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান থাকিব। ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছাই আমাদিগের মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। সুতরাং অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা রক্ষা করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় বশে থাকা চাই সন্ন্যাসী সত্যানন্দেরও তাহাই ছিল। সেই শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তিটী দেখিলেই বোধ হয় যেন যোগীশ্বর শঙ্করের ন্যায় ইনিও ইন্দ্রিয়জয়ী। সন্ন্যাসী আপনার বল না বুঝিয়া কার্যে হস্তক্ষেপ করার লোক নহেন। তিনি এই ইন্দ্রিয়জয়ে এতদূর সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়জয়টী তাঁহার কাছে লঘু বলিয়াই মনে হইত। তাই তিনি দলের নেতৃবর্গকেও ইন্দ্রিয়জয়ে পারগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

সত্যানন্দের ন্যায় কার্য্যাবলম্বিগণের প্রথমে আরও একটী শিক্ষার দরকার। তাঁহাদিগকে আত্মোৎসর্গে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। এই আত্মোৎসর্গ অর্থে আমি আপনার স্বার্থ প্রভৃতি বলির কথা বলিতেছি না, সে কথা অন্যত্র বলিব—নিজের জীবন দেওয়ার কথা বলিতেছি। হইতে পারে, অনুষ্ঠেয় কার্য্যের ফল স্বীয় জীবনটী দান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে, সে সময়ে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করা চাই। জীবনের মায়া পরিত্যাগ

সহজ কথা নহে—কার্য্যে এক প্রকার নেশা না হইলে তাহা পারা
ায় না। নিরক্ষর, অকর্ম্মণ্য, মস্তিষ্কহীন সৈনিকগুলিও মদ্যপান
া করিলে ভাল যুদ্ধ করিতে পারে না। সত্যানন্দের ন্যায়
লোকের জীবন—যদ্দ্বারা পৃথিবীর কত কার্য্য সুসাধিত হইতে
ারে—কি অনায়াসে ত্যাগ করা যায়! তাই সত্যানন্দও একটি
নশা অভ্যাস করিয়াছিলেন—সেই নেশা তাঁহার দেশপ্রতি প্রগাঢ়
অপ্রমেয় ভক্তি। এই ভক্তিবৃত্তি যেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই
্রমাণ ছাড়াইয়াও অনুশীলন করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে
কদিন মহাপুরুষের নিকট তিরস্কারও সহ্য করিতে হইয়াছিল।
—' —' অপূর্ব্ব স্থলটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অনেকানেক কথার পরে সত্যানন্দকে বলিতে-
ে আইস—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা
বে।' সত্যানন্দ উত্তর করিলেন,—'হে মহাত্মন্!
াভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না।—জ্ঞানে আমার কাজ
যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব।
বাদ কর্ন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।'

মহাপুরুষ বলিলেন,—'ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নির-
ঃ নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা [illegible] ? যুদ্ধবিগ্রহ পরি-
্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী
উন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।'

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি
লিলেন,—'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী
রিব।"

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা।

আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবে, চল! ইত্যাদি"

সত্যানন্দের ভক্তির নেশা ইহাতেই বেশ প্রতীয়মান হইবে ফলতঃ এই নেশাটি না থাকিলে সত্যানন্দ যতদূর সিদ্ধকাম হইয়া ছিলেন, ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ তবে মহাপুরুষের তিরস্কারবাক্যও এখানে বুঝিয়া দেখি হয়।

নিজে এইরূপে প্রস্তুত হইয়া সত্যানন্দ দল করিতে লাগিলেন। কিরূপে পরোপকার প্রভৃতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন বলিব, কি গুণ অভ্যাস করি চিরদিন তাঁহার এই সৃষ্টদলের নেতৃপদ স্থির রাখিতে পা ছিলেন। এরূপ দলপতির কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

দলস্থ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি—নিজের জীবনের ন্যায় প্রত্যেকের জীবনে মমতা রাখা, দলপতির একটি অত্যাবশ্যক গুণ দলপতি যদি মোড়ল হইয়া বসিয়া থাকেন ও আপনাকে দল অন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, সে দলপতিকে তাহারা আ না হয় দুই দিন পরে তুচ্ছ করিবেই। তাই সন্ন্যাসী সত্যানন্দে দলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত। গুরুলঘুভেদের একটি প্রধান সূ

সত্যানন্দ-চরিত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে বার এই স্থান, কাল, বর্ণনা, বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অনু করি। শস্যরোপণের পূর্ব্বে যেমন কৃষকগণ মৃত্তিকাকে সেই শ বর্দ্ধনের উপযোগী করিয়া লইয়া থাকে—মহাকবিগণ সেইরূ তাঁহাদের সৃষ্ট মহাচরিত্রের রস-বিকাশ জন্য গ্রন্থারম্ভে পাঠকে মন সেই রসগ্রহণের উপযোগী করিয়া লইয়া থাকেন। "হ্যামলেট্" এর প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের কথা মনে কর—সেই রাত্রি, সেই শীত, সেই নিস্তব্ধতা, সেই প্রেতযোনির আবির্ভাব মনে কর, হ্যামলেট্ চরিত্র মনে কর, এইরূপই তথায় দেখিতে পাইবে।

সত্যানন্দের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ নিশীথ সমে পূর্ব্ববর্ণিত অরণ্যমধ্যে। তথায় দেখিলাম, সত্যানন্দ কোন মনস্কাম সিদ্ধির জন্য ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, যেন তপস্বী বিশ্বামিত্র নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-কামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন —যেন মহাকাল মহাশ্মশানে যোগাসনে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ক্ষণপরে—

"সেই অন্তঃশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?' "

সেই ধ্বনি সেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল—কেহ কোন উত্তর করিল না। সলিলখণ্ডে হস্তচিহ্নবৎ তাহা সেই অন্ধকাররাশিতে মিশাইয়া গেল।

আবার সেই শব্দ হইল—আবার সেই ধ্বনি, সেই নিবিড় নিস্তব্ধতায় নির্ব্বিবাদে পরিণত হইল। আবার সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?" এবারে ে

করিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার পণ কি ?" সত্যানন্দ করিলেন, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব ।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" ত্যানন্দ বলিলেন, "আর কি আছে আর কি দিব। তখন উত্তর ল,—'ভক্তি'।"

এই উপক্রমণিকা পড়িতে পড়িতে যেন কোন একটা বিরাট ভাবের ছায়া হৃদয়ে প্রপতিত হইল। হৃদয়ের বাতায়নগুলি যেন ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। সংসারের স্বার্থের আলোক যন দূরে পলাইয়া গেল। বাহ্যেন্দ্রিয় যেন সংজ্ঞাবিরহিত হইল। াস্তে আস্তে তথায় সেই শালরাজিপরিবৃত বিশাল এক অরণ্য ৃষ্ট হইল। সেই তেমনই বিস্তৃত, তেমনই অন্ধকার। সেই তেমনই মহান্, তেমনই ভীষণ। আর সেই অরণ্য মধ্যে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার মধ্যে, মনের ভিতর যে মন, তাহার ভিতর যে মন, তাহারই অতি নিভৃতে, এক অতি মহান্ বিরাট পুরুষের ছায়া পড়িল। শরীর কণ্টকিত হইল—ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম, দেখিলাম, তথায় সত্যানন্দ বিরাজ করিতেছেন।

যাদুকরের অনেক কৌশল দেখিয়াছ—কিন্তু এমন প্রভাব কেহ কখনও অনুভব করিয়াছ কি? দিবা দুইপ্রহরে হঠাৎ এমন নিশীথের আবির্ভাব আর কেহ দেখিয়াছ কি? এমন লোকালয়ে হঠাৎ এমন অরণ্যসৃষ্টি আর কেহ অবলোকন করিয়াছ কি? এমন কোলাহলপূর্ণ সংসারের হঠাৎ এমন শ্মশানপরিণতি আর প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি?

বিস্মিত হইলাম, মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু কিছুই ত বুঝিতে পারিাম না। কে এই পুরুষ, কি ইহার মনস্কামনা? কে তাঁহার সহিত

কথোপকথন করিল? জানিতে বড় কৌতূহল জন্মিল।
পরিচ্ছদে প্রবেশ করিলাম। কি দেখিলাম? দেখিলাম এ
শ্মশান। মাতৃভূমি তাহাতে পুড়িয়া ভস্মরাশি হইতেছেন।
কারের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যপটখানি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপা
করিতেছি।

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল
কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া
দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে
বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন।
আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার
রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অক-
স্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে
বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে
খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা
তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাদ্য
পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর
সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা
বাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও
তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব
কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব
বারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল।
কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

"লোকে প্রথম ভিক্ষা করিতে আরম্ভ

।—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগা-
হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল,
ান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল,
র পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে
আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর
মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে
চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে
আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল,
যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা
পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া
প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ
বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল।
কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার
চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে
। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে।
 একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী
। ভয়ে পলায়।"

ভয়ানক দৃশ্য! কি শোচনীয় ব্যাপার! পাঠক একবার
নেত্রে ইহা অবলোকন কর। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—
খ—সম্মুখে, পশ্চাতে, দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে কি হৃদয়-
র! পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের দৃশ্যে যে একটা ঘন ঘটা
ছিলে—এখানে তাহার করাল ছায়া দেখিতে

াতিবিচার প্রথমেই ইহাতে ছিন্ন হইল। দলের সকলেরই ধর্ম্ম ।ক—সবই এক জাতি। এতদ্দ্বারা যেমন একপক্ষে দলের একতা নিবদ্ধ হইল, তেমনই আবার দলপতির স্বকীয় আসনও স্থির াকিবার উপায় হইল।

তার পরে দলপতির নিজে নিঃস্বার্থপর ও নির্লোভী হওয়া ইহা না হইলেও দলপতির আসন স্থির রহিতে পারে না। নন্দের ন্যায় নিঃস্বার্থপর ও নির্লোভী ব্যক্তি কয়জন দেখিতে ? ক্ষুদ্র দলই বল, আর বড় দলই বল, দলপতির স্বার্থ ও ত দল কিরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, ও দলের অনুষ্ঠেয় কার্য প সম্পন্ন হয়, তাহা আধুনিক ভারতভক্তগণ অনেকেই জানিছেন। যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জীবানন্দ সত্যানন্দকে ংহাসনে স্থাপিত করিতে চাহিলেন, সত্যানন্দ বলিলেন,—

'ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা কেহ ়। আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। ার অধিকার হইলে, যাঁহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজ-ুট পরাইও; কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব কর্ম্মে যাও।'

এইরূপ স্থলে এইরূপ ব্যবহার ইতিহাসে দুই একটি মাত্র ়খিতে পাওয়া যায়। তবে আজকাল অনুকরণপ্রিয়তার বলে ূপ কথা অনেক শুনা যায় বটে। কিন্তু দলপতিগণের সে কথা কথার কথা মাত্র।

ইহার পরে দলপতির আর একটি প্রধান গুণ ক্ষমা। লস্থ লোকের ক্ষুদ্র বৃহৎ অপরাধ যিনি সময় বুঝিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে

ক্ষমা করিতে না জানেন, তিনি দলপতির আসন কখনও স্থির রাখিতে সমর্থ হয়েন না। সন্ন্যাসী সত্যানন্দের এই ক্ষমাগুণ কিরূপ বিকশিত ছিল, তাহা 'আনন্দমঠ'এর পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন। প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট পরনারীপ্রতি আসক্ত ভবানন্দকেই তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। অত বড় ধর্ম্মানুরাগ—তাহাতে অত বড় পাপে ক্ষমা—বড় সহজ কথা কি ? কিন্তু ইহা চাই—নতুবা থাকিবে কেন ?

আমরা এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে স্বয়ং কিরূপে (হইয়া কার্য্যারম্ভের জন্য দল বাঁধিতে হয়, তাহা দেখাইয় কিরূপে সেই দলের মধ্যে একতাস্থাপন ও দলপতির ভ বজায় রাখিতে হয়, তাহাও দেখাইয়াছি ; এখন, সেই অনু কার্য্য সম্পন্ন করিতে আর কি কি আবশ্যক, তাহাই দেখাই চাহি।

পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত হইলে, একমাত্র বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বা সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়। বুদ্ধি সকল কার্যে আবশ্যক—যেমন তেমন লোক দলপতি হইয়া ওরূপ কার্য্য সম্প করিতে পারে না। উক্তরূপ দলপতিকে চাণক্য বা বিস্মা ন্যায় কূটবুদ্ধিশালী হওয়া চাই। সত্যানন্দ সেইরূপই বুদ্ধিম ছিলেন। তদবলম্বিত কৌশল, সতর্কতা ও কার্য্যপ্রণালী গ্রন্থপা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

এ হেন সত্যানন্দই এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত। নতুবা র যদু, শ্যামের কি দেশোদ্ধার সাজে ? ঐ যে কথায় বলে,—"ঢ নাই, তরোয়াল নাই, চোখারাম সর্দ্দার !"

এখনকার দলপতিগণের আছে, কেবল বক্তৃতার ক্ষমতা

কাথায় সে অধ্যবসায়, কোথায় সে ঐকান্তিকতা, কোথায় সে ন্দ্রিয়সংযম, কোথায় সে স্বার্থত্যাগ—লোভত্যাগ, কোথায় সে মতা, আর কোথায় সে আত্মোৎসর্গ!

কবি সুসময়েই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা সত্যানন্দের ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্যানন্দের য় সাধনা করুন। শুধু বক্তৃতা অভ্যাস করিয়া সত্যানন্দের র্ম অবলম্বন করা যায় না।

(২) শান্তি।

"আনন্দমঠ" উপন্যাসের দুইটী মাত্র চরিত্রেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমালোচনা আবশ্যক। একটী—সত্যানন্দ, অপরটী—এই ন্তি।

শান্তির পূর্ব্বপরিচয় এইরূপ:—

"শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে, মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে ল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি ান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

"কাজেই, শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, ন্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি াত্র বাস করিত; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে

বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

"এইরূপ শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এ হইল, যে শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথ শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপ পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাই দিলে তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরি টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শান্তিও খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টো ছাত্রেরা কাঠের চিরণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুল কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে, ও গালের উ তুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শান্তি করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছ দিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্ত্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতের দুইচা বুক্‌নি দিয়া, দুই একটা আদিরসাশ্রিত গল্প করিতেন, পাখির মত শান্তি সেগুলিও শিখিল—টিয়া পাখির মত, তা অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না।

"দ্বিতীয় ফল, এই হইল যে শান্তি একটু বড় হই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শি আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভ রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ কর লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া, শান্তির পিতা 'যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্য

লিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র ীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাক-ণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তার পর ব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

"তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভাল বাসিত—শান্তিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। একজন তাহাকে দয়া য়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রো তাহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

"তখন জীবানন্দের পিতা মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা াতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নয় কে?' জীবানন্দ বলিলেন, 'আমি আনিয়াছি—আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব।' পিতা মাতা বলিলেন, 'ভালই!' জীবানন্দ অনূঢ়,—শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত। অতএব জীবা- তাহাকে বিবাহ করিলেন।

"বিবাহের পর, সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। লেই বুঝিলেন, 'কাজটা ভাল হয় নাই!' শান্তি কিছুতেই য়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে াটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর কোথায় হরিণ, দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর শাশুড়ী

প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘ শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড় পীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খো পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

"জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয় শান্তি বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দ সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এক দল স দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিল।

"তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অন্যা গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহ —রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয় আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

"শান্তি বালকসন্ন্যাসিবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায় ম মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখ চতুরতা, এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া, ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয় অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

"ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল, যে এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

"সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শান্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদিরসাশ্রিত কাব্য সকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। ...তে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। ... কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই; এখন স্ত্রীস্বভাব- ... লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষচরিত্রের ...র নির্ম্মল স্ত্রীচরিত্রের অপূর্ব্বপ্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির কি... উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া না...

কা... ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক ...ক দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় ...য়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিল ঘুষার ... পূজিত করিত—কিল ঘুষাগুলি সহজ নহে। একদিন ...সী ঠাকুর শান্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া ...র হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতাখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল, যে সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শান্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

"শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে, এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

"জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হই ন্; পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন ত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছি য়' শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চি চ পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

"অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া রত্নে যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম কেহ প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে পনে জ্বালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়, মনু এবং কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেবের পরেও কখন ছিল, আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন, যে সিন্ধু থিয়া টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্ধুকেই টাকা লইয়া যান; যার প্রায় সবগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটি াহা

লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন দুর্ব্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছাড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না —হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া প্রথম শান্তিকে জানাইল যে সে বুক মেয়ে মানুষের বুক—বড় নরম জিনিষ। নবমেঘনির্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

"জীবানন্দ বলিল, 'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। ম যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া চ।'

"শান্তি বলিল, 'তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?' জীবানন্দ ত্তর না করিয়া, কোন দিক্ না চাহিয়া সেই পথিপার্শ্বস্থ কলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান লাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

"মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসি-। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি য়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। নীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক ার নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে

বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীর রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইল; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক,শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল।"

এই পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে একটী রহস্য আছে। "আনন্দমঠ"এর পঞ্চম সংস্করণেই এই পূর্ব্বপরিচয় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণ "আনন্দমঠ" যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহাদিগের সুবিধা জন্য আমরা পূর্ব্বপরিচয় বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিলাম। সমালোচনা পড়িবার সময়ে পুস্তকখানি একবার পড়িয়া লই ভাল হয়, কিন্তু আমরা সচরাচর তাহা করি না। পূর্ব্বপাঠজা স্মৃতির উপরেই নির্ভর করিয়া সমালোচনা পাঠ করি। এই আমরা অনেক স্থলেই গ্রন্থের অংশগুলি বিস্তৃতরূপে উ করিয়া থাকি।

এই পূর্ব্বপরিচয় পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া আমরা শান্তি কোন কলঙ্ক ছিল, এরূপ বিবেচনা করি নাই। কিন্তু কেহ না কি তাহা করিয়াছেন। এই জন্য গ্রন্থকার বিজ্ঞা লিখিয়াছেন "শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া দি দেওয়া গেল।"

গ্রন্থকারের এইরূপ কার্য্যের আমরা পক্ষপাতী নহি।

সমালোচক ও পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাহা গ্রন্থকারের চাপা রাখাই ভাল। সেই চাপা ভাব বা কথা বুঝিতে যে একটু চিন্তা বা কল্পনার প্রসার হয়, তাহাই পুস্তকপাঠের অন্যতম প্রধান সুখ ; অন্ততঃ আমরা এইরূপই মনে করি। অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকার পাঠকসমালোচককে এরূপ চিন্তা ও কল্পনা প্রসারিত করিবার অবকাশ দিয়াছেন—কিন্তু শান্তিচরিত্রে তাঁহার কতক ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। আমরা যেরূপ পাঠক, তাহাতে এ জন্য তাঁহাকে দোষীই বা বলি কি করিয়া ? আমরা উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রে,ঘরের গৃহিণী দেখিতে চাই, একটু পান হইতে চুণ খসিলেই অস্বাভাবিক বলিয়া গ্রন্থকারকে গালাগালি করি—আমরা abstract ও concrete বুঝি না—আমরা রক্তমাংসগঠিত মানুষ ও ভাবগঠিত মানুষের পার্থক্য বুঝি না—আমরা চলনসই ও আদর্শের বিভিন্নতা বুঝি না—আমাদিগকে এইরূপই বুঝাইতে হয় বই কি। এই শান্তিচরিত্র লইয়া কি অল্প হুলস্থূল গিয়াছে ? ইহার অস্বাভাবিকতা ধরিয়া কি অল্পলোকে গ্রন্থকারকে গালি দিয়াছে—কাজেই, গ্রন্থকার ধৈর্য্য রাখিতে পারেন নাই, শান্তিচরিত্রের স্বাভাবিকতা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়া থাকিলেও—আমরা ইহাকে নিষ্ফল প্রয়াস বলিব। উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রে যদি ভাব জমিয়া গেল, তবে তাহার স্বাভাবিকতা লইয়া অস্থির হইতে চাহিব কেন ? স্বাভাবিক না হইলে কি ভাব জমিতে পারে ? কই আরব্যউপন্যাসচিত্রিতচরিত্র পড়িলে ত বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের চরিত্রপাঠের ন্যায় আনন্দ উপলব্ধি হয় না! কেন হয় না ? না—সেরূপ ভাব আরব্যে জমে নাই। কেন জমে নাই ? এ প্রশ্নটির উত্তর একটু খুঁজিতে হয় না কি ? তবে

আমাদের এ অনর্থক অস্থিরতার জন্য গ্রন্থকার কেন অস্থির হইলেন, জানি না।*

তারপরে আমরা প্রথমে দেখিলাম, জীবানন্দের ভগিনী শ্রীমতী নিমাইমণি জীবানন্দের নিকট শান্তিকে লইয়া যাইবার জন্য শান্তির মস্তকে অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল (অনেক দিনের রুক্ষ কেশ কি না) লইয়া মাখাইয়া দিতেছে। শান্তি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতচিত্তে নিমাইয়ের চরিত্র সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু বড় একটা আপত্তিও করিতেছে না—যেন রঙ্গ দেখিবার জন্যই চুপ করিয়া আছে। তার পরে যখন নিমাই আসল কথা খুলিয়া বলিল—শান্তির আর রঙ্গপিপাসা রহিল না—সে আর নিমাইর কথামতে চলিতে রাজি হইল না। সেই শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসনেই শান্তি স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইল। গিয়া দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষকাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। দেখিয়া শান্তি কাঁদিল না—জীবানন্দের হাতে হাত লইয়া বলিল—

'ছি, কাঁদিও না, আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।'

জীবানন্দ অনেক দুঃখ করিলেন—বলিলেন—

'ব্রত ভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি

---

* তিনি জীবিত থাকিতেই আমরা তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র—কোন উত্তর করেন নাই।

না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। * * * একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎ সংসার, এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই এক দিকে—আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময়ে বুঝিতে পারি না যে, কোন দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? * * * পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।'

শান্তি এই কথা শুনিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন, পরে বলিলেন, 'ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভাল বাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ, আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?'

শান্তি জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা জানিতেন না। তখন বুঝিলেন। পরে বলিলেন, 'এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।'

ইহাতে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম যে শান্তির ধৈর্য্য, সংযম বা সহিষ্ণুতা রমণীজগতে অতুলনীয়া। সংযমী জীবানন্দ আজি শান্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহারই জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে-ছেন—শান্তি তাহা দেখিয়া এক ফোঁটা চক্ষের জলও জীবানন্দকে

দেখিতে দিলেন না। চক্ষের জল কি আসে নাই? কে বলিবে— ঐ নয়নপ্রান্তে পর্ব্বতনিঃসৃত, বহুদিনপ্রতিরুদ্ধ নির্ঝরিণীস্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে যে বারিস্রোত নিঃসৃত হইবার জন্য বলপ্রকাশ করিতেছিল—সে স্রোতের বল কে বুঝিবে? কিন্তু শান্তি তাহা ত বহিতে দিল না। অনুপমেয় সহিষ্ণুতাবলে শান্তি তাহা নয়ন-প্রান্তেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। কারণ শান্তি জানিত— প্রেমিকা পত্নীমাত্রই ইহা জানে যে—সে স্রোত বহিলে পর্ব্বতের ন্যায় পুরুষেরও ধৈর্য্য, প্রতিজ্ঞা সব ভাসিয়া যায়। যেখানে সেরূপ ঘটিলে জীবানন্দের পক্ষে ধর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা, সেখানে শান্তি তাহা ঘটিতে দিবে কেন? দেখিলাম, শান্তি তাৎকালিক সুখ অপেক্ষা ভবিষ্যতের অনিষ্ট গুরু জ্ঞান করিল। কাঁদিতে পারিলে— ঐ ক্রন্দনরত জীবানন্দের ক্রোড়োপরি মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে পারিলে—শান্তির যে স্বর্গসুখ অপেক্ষাও অধিক সুখ হইত! সুখ হয় বলিয়াই ত ক্রন্দনের এত প্রলোভন। কিন্তু শান্তি দেখিল যে, সে সুখ অসার ও পরিণামে দুঃখজনক। তাই সামান্য প্রেমিকার ন্যায় শান্তি কাঁদিল না, অথবা তাহার চক্ষের জল জীবানন্দকে দেখিতে দিল না। জ্ঞান প্রেমে যুক্ত হইয়া সামান্য প্রেম হইতে কত উচ্চে দাঁড়াইল।

দেখিলাম, শান্তি সামান্য কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করে না। জীবানন্দ তাহাকে কত কষ্ট দিতেছেন কিন্তু তবু শান্তি বলিল যে, 'তুমি আমাকে যে প্রকারে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।' এ কি মিথ্যা কথা, তাহা নহে। শান্তি জীবানন্দের ব্রতকথা জানিত, জীবানন্দের কার্য্য যে ধর্ম্মসঙ্গত তাহা সে বিশ্বাস করিত, তাই সে ধর্ম্মনিরত স্বামীর ধর্ম্মজন্য সম্পাদিত কার্য্যে কষ্ট বোধ করিল

না। তাহার নিকট স্বামীর প্রণয়প্রাপ্তি অপেক্ষা স্বামীর ধর্ম্ম-চর্য্যায় সহায়তা অধিকতর সুখের বোধ হইল।

দেখিলাম, শান্তি অপূর্ব্ব শিক্ষাবলে প্রলোভন জয় করিতে শিখিয়াছে। সে কি সামান্য প্রলোভন? রমণীর পক্ষে—পতি-প্রেমানুরতা রমণীর পক্ষে—সে যে দুর্জ্জয় অপরিহার্য্য প্রলোভন! বহুদিন স্বামীর সহিত দেখা নাই, বহুদিন স্বামী গৃহত্যাগী, সেই স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে চাহিতে-ছে—একি সাধারণ প্রলোভন? সেই স্বামী আবার তাহাতেই একানুরত—মৃত পতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলে কোন্ সাধ্বী প্রেমিকা তাহা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারে? কিন্তু শান্তি এ প্রলোভনও দিব্য জ্ঞানবলে দূরে নিক্ষেপ করিল। বলিল—"ছি—তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না।" শান্তি স্বামীর প্রণয়-সুখও চাহেন না—জীবানন্দ বরং শান্তিকে নাই ভালবাসিবেন--হায় কোন্ রমণী অক্ষত হৃদয়ে ইহা মনেও স্থান দিতে পারে?—তিনি তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। ধন্য শান্তি—ধন্য জীবানন্দের সহধর্ম্মিণী! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব শিক্ষা! ইহাকেই ত সহধর্ম্মিণী বলে। পাঠক এখন একবার রমাকে মনে কর দেখি—রমার সেই প্যান প্যান ভ্যান ভ্যান ভাব কল্পনা কর দেখি—শিক্ষার পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। অথবা অতদূরই বা যাইতে হইবে কেন—তুমি যদি অল্প বেতনের কোন চাকুরে হও, বা উচ্চ শ্রেণীস্থ কোন স্কুলের ছাত্র হও—স্বামিসহবাস-সুখের জন্য সাধ্বী পত্নীও কিরূপে স্বামীর কর্ত্তব্যপথে বাধা জন্মা-

ইতে পারে, তাহা সহজেই ভাবিয়া দেখিতে পারিবে। আবার ইহাতে বড় একটা সুন্দর রহস্যও আছে। সেই যে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে স্ত্রীর বাধা প্রদান—তা আবার বড়ই সুন্দর একটী মোহকর আবরণে আবৃত। সব সময়ে তাহা ভেদ করিয়া আসল ব্যাপারটি বুঝা যায় না। রমার সেইরূপ ভাবে কি আমাদিগের মনে আনন্দ বই আর কিছু উদিত হয়? সে সময়ে আমরা রমণীগণের প্রেমপ্রাবল্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়ি—তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিস বলিয়া বিবেচনা করি। বস্তুতঃও তাহা যে মন্দ, এরূপ নহে। তবে তাহারও উৎকর্ষ আছে। অকৃত্রিম প্রণয় ত আদরের জিনিস—কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যদি তাহা মার্জ্জিত না হয়, তবে তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে স্বার্থ প্রভৃতি কতকগুলি নিন্দিত ভাবের সূক্ষ্ম চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্তির প্রণয়ে ইহা ছিল না। একেবারে ছিল না বলিলে শান্তিকে প্রশংসাই করা হয় না। ছিল, নতুবা শান্তি জীবানন্দের কথাগুলি শুনিয়া কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না কেন? তাহাতেই যেন তাহার মনের ইতস্ততঃ ভাবটা দেখিতে কবি আমাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহা ত থাকিবেই—নতুবা শান্তির জ্ঞানের পরিচয়—অপূর্ব্ব জ্ঞানবলে রমার সেই অকৃত্রিম কিন্তু অমার্জ্জিত প্রণয়ের শোধিত ভাব, আমরা কি ভাল দেখিতে পাইতাম? প্রলোভন যদি অন্য রমণীর ন্যায় শান্তি অনুভব করিতে না পারিত, তবে তাহার বাক্যে আমরা এত প্রশংসা করিব কেন?

শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জীবানন্দ চলিয়া গেলে, আমরা দেখিলাম—শান্তি বহুক্ষণ ধরিয়া নির্জ্জনে গম্ভীরভাবে কি ভাবনা ভাবিয়া স্ত্রীবেশ পরিবর্ত্তন করিল! বহুযত্নসংরক্ষিত একটি পুস্ত-

কের পেটিকা খুলিয়া কতকগুলি তুলটের পুঁথি বাহির করিল। অগ্নি জ্বালাইয়া একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে, শান্তি সন্ন্যাসিবেশে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। যাইতে যাইতে পথে গায়িতে লাগিল—

"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"
"সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমরতরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।"

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে।"

শান্তির এরূপ কার্য্য দেখিয়া আমাদিগের বোধ হইল যেন বহুদিন হইতেই এইরূপ একটা সঙ্কল্প তাহার হৃদয়ে স্থিরীকৃত ছিল। শান্তি যাহা করে, তাহা সহসা করে না। ঘটনাও প্রকৃত তাহাই। বহুদিন হইতেই শান্তি জীবানন্দের নিকট যাইতে মনস্থ করিতেছিল। তবে এত দিন জীবানন্দের ব্রত-চ্যুতি-প্রায়শ্চিত্ত ভয়ে যাইতে পারে নাই। অদ্য সে ভয় অপ-

সারিত হইল—একবার দেখা শুনায়ও যে প্রায়শ্চিত্ত, বহুবারেও তাহাই—তাই শান্তি আজি জীবানন্দের উদ্দেশে সন্ন্যাসিবেশে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। জীবানন্দের সহিত অদ্যকার সন্দর্শন ইহার এক উত্তেজক কারণ।

পাঠকগণ, একবার শান্তির সঙ্গীতটির প্রতি কর্ণপাত করুন। গান যে সুন্দর তাহা নহে, বরং গান অতি সাধারণই বলিতে হইবে। কিন্তু এই গানে আর একটি বড় সুন্দর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই গানটির বিষয় কেমন স্বাভাবিক! শান্তি ইহাতে একবার তাহার কথা বলিতেছে—আবার জীবানন্দের কথা বলিতেছে। একবার শান্তি হইয়া বলিতেছে—"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে" আবার জাবানন্দ হইয়া বলিতেছে—"সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে—" ইত্যাদি। একবার শান্তি হইয়া বলিতেছে—"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না" আবার জীবানন্দ হইয়া বলিতেছে—"ওই শুন বাজিতেছে রণজয় বাজনা।" একবার শান্তি সামান্যা রমণীর ন্যায় তাহার জীবানন্দকে রণে গমন করিতে বাচনিক নিষেধ করিতেছে—আবার কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, জীবানন্দের মুখ হইতে তাঁহার অভীপ্সিত সুন্দর উত্তর গায়িতেছে। বিরহিণী শান্তির এই অপূর্ব্ব প্রেমালাপ বড়ই স্বাভাবিক ও চিত্তহারী। শান্তির ন্যায় রমণী যার তার কাছে মনের কথা বলিয়া দুঃখ দূর বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাই যার তার কাছে মনের কথা বলা শান্তির অভ্যাসও ছিল না। তাই সে এইরূপ আপনা আপনিই মনের কথা বলিত।

ইহার পরের দৃশ্যে আমরা দেখিলাম—শান্তি পুরুষবেশে,

সত্যানন্দসন্নিধানে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যানন্দের নিকটে কিন্তু সে পুরুষবেশ গোপন রহিল না। বুঝি তাঁহার নিকটে সে বেশ গোপন করিতে শান্তির ততটা ইচ্ছাও ছিল না। পুরুষবেশ কেবলমাত্র অন্য লোকের চক্ষে ধূলি দিতে। দেখিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বহু তিরস্কার করিলেন। শান্তি মুখরার ন্যায় সত্যানন্দকে কয়েক কথা শুনাইয়া দিল। পরে সত্যানন্দ তাহার বলবিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রথমে শান্তিকে চিনিতে পারিলেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন শান্তি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী, তখন সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন—

"কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?" শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নতমুখে বলিল—

'পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।'

বলিতে বলিতে শান্তির গ্রীবা উন্নত হইল—বক্ষ স্ফীত হইল—অধর কাঁপিতে লাগিল—আবার এদিকে চক্ষেও দুই এক ফোঁটা জল আসিয়া জমিতে লাগিল। সন্তাননায়ক সত্যানন্দ পূর্ব্বেই তাহার বলবিক্রম দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন; মনে ক্ষোভ ছিল, কেবল জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতির ভয় জন্য শান্তির এই কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন—বলিলেন,

"তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা, পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী, বীরধর্ম্মে রমণী কি?"

শান্তি ইহার উত্তরে মহাভারতের দৃষ্টান্ত দেখাইল। সুভ-

দ্রার কথা বলিলেন; দ্রৌপদীর কথা বলিলেন। সত্যানন্দ শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন—

'তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণীজাতির সঙ্গে, একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত, তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।'

শান্তি যেন সদর্পেই বলিলেন—

'আমি আপনার দক্ষিণ হস্তের বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রতচারিণী,প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি, তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।'

শান্তিচরিত্রের মূল লক্ষ্য এই দৃশ্যে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী কাহাকে বলে—পতিপ্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য কি—কর্ত্তব্য-পরায়ণা সহধর্ম্মিণী কর্তৃক পতির কি কি কার্য্য হইতে পারে, তাহা শান্তি এই স্থানে যেরূপ বলিয়া গিয়াছে, পরে কার্য্যেও সে সেইরূপ করিয়াছে। শান্তিকে প্রথম মুখ ফুটাইয়া মনের কথা বলিতেও আমরা এইখানেই শুনিলাম। শান্তির শিক্ষা—শান্তির পতিপ্রেম, যে কত উন্নত, প্রথমে এই স্থলেই তাহার পরিচয় পাইলাম।

শান্তি সত্যানন্দের এই কথোপকথনে শান্তির স্থৈর্য্য,প্রতিজ্ঞাবল সংযম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ শুন, শান্তি কেমন গর্ব্বিতের ন্যায় বলিতেছে—প্রকৃত বীরজায়ার ন্যায় বলিতেছে—"বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই।" * * * "পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে

সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তান ধর্ম্ম অধর্ম্ম।"

কত বড় তেজের কথা! সন্ন্যাসী সত্যানন্দসন্নিকটে গৃহরমণী শান্তিমণির এই মানসিক তেজপ্রখরা শিক্ষা সেই হৃদখানিকে অতি প্রোজ্জ্বলভাবে দেখাইয়া দিতেছে।

পাঠকবর্গ, এখন আর একটি দৃশ্য অবলোকন করুন।

প্রকৃতির নির্জ্জন প্রদেশে—নিবিড় অরণ্যমধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীর। শাখাপত্রপুঞ্জে কুটীরটী আবৃত—লতাপল্লবে কুটীরটী সমাচ্ছাদিত। সেই কুটীর মধ্যে একটি যুবক আর একটি যুবতী একট স্বামী—অপরটি পত্নী। একটি ব্রহ্মচারী জীবানন্দ—অপরটি ব্রহ্মচারিণী শান্তি।

শান্তি কুটীরে বসিয়া গায়িতেছে—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

জীবানন্দ সারঙ্গের মধুর নিক্কনে বাজাইতেছেন—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

পাঠক একবার এই দৃশ্যটি কল্পনাচক্ষে দেখিয়া লও—সেই স্থান-কাল-পাত্র মনোমধ্যে ভাবিয়া লও। ক্ষণকাল নাটক নবেলের কথা ভুলিয়া গিয়া একবার আপনাদিগের কথা স্মরণ কর—একবার মনুষ্যকে মনুষ্যের ন্যায় ভাবিয়া দেখ। নতুবা আমরা যাহা বলিব, তাহা বুঝিবে না, তাহা কুরুচিকর বলিয়া জ্ঞান করিবে।

এ জগতে যিনিই যত দম্ভ করুন না কেন—ইন্দ্রিয়শক্তির

নিকট কাহারও বড় একটা স্পর্দ্ধা খাটে না। পুঁথিপত্রে অনেক লেখা যায়, উপদেশে অনেক বলা যায়, কিন্তু কার্য্যে এ শক্তিকে পরাভব করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, ইহার প্রতিপত্রে এই শক্তি কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। এই পৃথিবীতে যত বিপ্লব ঘটিয়াছে, যত হত্যা হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই শক্তিরূপিণী রমণীর জন্য। শুদ্ধ ইতিহাস বলি কেন, ইতিহাস ত মনুষ্য লইয়া, পুরাণ প্রভৃতি দেখ—যেখানে দেবচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেখানেও ইহার প্রভূত ক্ষমতা অবলোকন কর। অথবা দেবতা হইতেও যাঁহারা উচ্চ, সেই সকল সিদ্ধযোগীসাধুজনের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে সেখানেও এ শক্তি সকল সময়ে পরাভূত হইতে পারে নাই। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, মানবসৃষ্টিরহস্য স্ত্রীপুরুষের অপরূপ সম্বন্ধ লইয়া। এখন আমরা বলি, স্ত্রীপুরুষের সেই অপরূপ সম্বন্ধ এই মনোহারিণী শক্তি লইয়া। ইহার রূপ অনন্ত, লাবণ্য অনন্ত—ক্ষমতাও অনন্ত। যে শক্তির বলে ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন, তাহা অপূর্ব্ব হওয়া বিচিত্র নহে। এ শক্তিকে সর্ব্বদা পরাভব করিতে পারে, এরূপ বীর অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কথায় অনেকে হাতি ঘোড়া মারিয়া থাকেন, কিন্তু কাজে আবার তাঁহাদিগকে সামান্য মশার জ্বালায় বিব্রত দেখিতে পাই।

এই শক্তির অপূর্ব্ব ক্রীড়া কুমারসম্ভবে অতি সুন্দর বর্ণিত আছে। কুমারসম্ভবকার অবশ্য মূলবিষয়টি পুরাণ হইতে গ্রহণ-করিয়াছেন—কিন্তু তবু সে ঘটনা মনে করিতে হইলে কুমারসম্ভবই মনে করিতে হয়। পাঠক, একবার সেই মদনভস্ম মনে

কর। যোগেশ্বর পরমযোগী, ভগবদ্ভক্ত, ভবদেব একান্তমনে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন—ঐ দেখ, ঐ দুর্জ্জয় শক্তি সহসা তাঁহাকেও আলোড়িত করিয়া তুলিল। যিনি দেবাদিদেব মহেশ্বর, যাঁহার কণ্ঠে হলাহল বিরাজিত, ভালে অনল প্রজ্বলিত—স্কন্ধে ভুজঙ্গ লম্বিত—জটাজূটে মন্দাকিনী শোভিত—শ্মশান যাঁহার বিলাসভবন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার পরিধান—ভস্মজাল যাঁহার বিভূতি—প্রেতগণ যাঁহার সঙ্গী, তাঁহারই একদিন এই শক্তির নিকট কিরূপ অপদস্থ হইতে হইল, দেখিলে! তুমিআমি কি ইহার নিকট স্পর্দ্ধা করিতে পারি? এই সুন্দর ঘটনায় ইন্দ্রিয়শক্তির ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে—আমি আর অধিক কি লিখিব? আর ইহা না লিখিলেও চলে—কে না ইহার অপরিসীম প্রভাব অবগত আছেন?

বড়র সহিত যদি ছোটর তুলনা অবৈধ না হয়, তবে আজি সেই মদনভস্মের দৃশ্যের সহিত আমাদিগের এই পূর্ব্ববর্ণিত দৃশ্য তুলনা কর।

জীবানন্দ সন্ন্যাসী—জীবানন্দ ব্রহ্মচারী; জীবানন্দ যে ব্রতধারিগণের নায়ক, তাহাদের স্ত্রীর সহিত একাসনে বসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সহজ প্রায়শ্চিত্ত নহে। প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

এ হেন জীবানন্দ তোমার আমার মত লোক নহেন। এখন দেখ, সেই জীবানন্দের সহিত সেই শক্তির অপূর্ব্ব সংগ্রাম। ঐ দেখ, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে জীবানন্দের শরীর সিহরিয়া উঠিল। মন্মথ ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিল। জীবানন্দ শান্তিকে বলিলেন—

"দেখ শান্তি। এক দিন আমার ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমার

প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এতদিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—"

জীবানন্দ কি বলিতেছিলেন, তাহা শান্তির উত্তরেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। স্বামীর মনোভাব স্ত্রী যেমন বুঝিতে পারে, এমন আর কে পারে?

কি দেখিলাম? দেখিলাম, শিবমদনসংগ্রাম! দেখিলাম শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি। দেখিলাম শিবের পরাজয়। দেখিলাম, ইন্দ্রিয়শক্তির নিকট জীবানন্দের পরাভব। জীবানন্দ কি সহজে পরাজিত হইয়াছিলেন? তাহা নহে। সেই স্থান, কাল, পাত্র মনে কর! সেই সহধর্ম্মিণী শান্তি মনে কর—সেই শান্তির সঙ্গীত মনে কর। সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে কর—তবেই জীবানন্দের মানসিক পতন বুঝিতে পারিবে। জীবানন্দ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ইচ্ছা করিয়া সে শক্তিকে আহ্বান করেন নাই—ভোগেচ্ছায় জীবানন্দের এ মানসিক পতন ঘটে নাই। এ জন্য জীবানন্দকে কেহ ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিতে পারিবে না।

আরও কি বিশ্লেষণের দরকার। তার পরে দেখ—মদনভস্ম অধ্যায়। অগ্নি জ্বলিয়াছে, সম্মুখে দহমান পদার্থ বিরাজিত। একটু স্ফুলিঙ্গ স্পর্শ হইলেই সব শেষ হয়। একটু আত্মসংযমের অভাবেই সব মিটিয়া যায়। 'দুইটি বিদ্যুৎগর্ভ তড়িৎ—একটু সামান্য স্পর্শেই ইরম্মদ ছুটিয়া যায়।' মহাদেব কামশরে আহত—

সম্মুখে পরম রমণীয়া পার্ব্বতী বিরাজিতা! এক মুহূর্ত্তের মিলনে যুগান্তর ঘটিয়া যায়। কিন্তু দেখ কি সুন্দর আত্মসংযম—কি সুন্দর মদনভস্ম!

দেখ শান্তি কি বলিতেছে—

"আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জনে একত্রে সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিয়াছি। তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি কি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?"

শিবের কটাক্ষে মদন ভস্মসাৎ হইয়া গেল। শান্তির সামান্য কথায় ইন্দ্রিয়শক্তি শতযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ধন্য শান্তি—ধন্য কবি!

"কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন! তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ কোন দিন ত একাসনে বসো নাই।"

শান্তির এই কথাটী আনন্দমঠের পূর্ব্বসংস্করণে ছিল না।

এই কথাটি বড়ই সুন্দর। জীবানন্দ পাপ করিয়াছেন, এ কথা শান্তির মর্ম্মান্তিক কষ্টদায়ক। আমরা যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার কোন অপরাধ দেখিলে, আমরা সে অপরাধকে লঘু করিবার অনুকূল অবস্থাই (extenuating circumstances) অগ্রে অনুসন্ধান করি। জীবানন্দ বরাবর বলিয়া আসিতেছেন যে, তিনি পাপ করিয়াছেন—ব্রতভঙ্গ করিয়াছেন; সেই পাপের বিষয়টা অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা শান্তির হইল। এই ইচ্ছা লইয়া, শান্তি যখন দেখিলেন, প্রতিজ্ঞাসময়ে স্পষ্টতঃ একাসনে বসিবার কথাটারই উল্লেখ থাকে, তখন শান্তি সেই কথাটিই বিশেষ করিয়া ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবানন্দ কোন পাপানুষ্ঠান করেন নাই। সেই কথার মূলে যে তত্ত্ব আছে, যাহা ভাবিয়া জীবানন্দ মনে করিতেছিলেন, তিনি ব্রতভঙ্গ করিয়াছেন, শান্তি তাহা দেখিতে চাহিলেন না—শান্তি সেই কথার বাহিরের অর্থ ধরিয়াই জীবানন্দকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। শান্তির এইরূপ চেষ্টায় তাঁহার কমনীয় পতিপ্রেম অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। শান্তি হাজার হউক—রমণী ত বটে। এ দুর্ব্বলতাটুকু তাহাই বলিয়া দিতেছে।

শান্তিজীবানন্দের পূর্ব্বোক্ত অভিনয়ের পরে জীবানন্দ কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। শান্তি একাকিনী গায়িতে লাগিলেন—

> "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
> বিহিত বিচিত্র চরিত্রমখেদং
> কেশব ধৃতমীনশরীর
> জয় জগদীশ হরে!"

এইসময়ে শান্তি যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা পাঠকগণ একবার ভাবিয়া লইবেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ওয়েলিংটনের যেটুকু আনন্দ হইয়াছিল, বর্ণিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া শান্তি ততোধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। এ আনন্দ যে কি মধুর, কি স্নিগ্ধ, কি শীতল, কি প্রসাদগুণশালী, তাহা প্রলোভনজয়ী মহাত্মারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

শান্তি যখন চিত্তের এই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন প্রভু সত্যানন্দ তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সত্যানন্দকে দেখিয়া শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পাদধূলি গ্রহণ করিলেন—বলিলেন—

প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন আমাকে কি করিতে হইবে।"

শান্তির হৃদয় তখনও উচ্ছ্বসিত ছিল—সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উপযুক্ত কথাই শান্তি বলিল—উচ্ছ্বাসের সময়েই কথায় অলঙ্কার ঘটে।

সত্যানন্দ বলিলেন—'মা তোমার কুশলই হইবে।'

"শান্তি। কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য!

"সত্য। তোমায় আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে

পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

"সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনীবিরাজিত বিদ্যুত্তুল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল 'কি ঠাকুর। আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি আমার স্বর্গ নাই?'

"ব্রহ্মচারী বলিলেন যে 'আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।'

"বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে। আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিব, মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

দেখিলে সুর কোথায় উঠিল। মানবচরিত্রের উত্থান ও পতন দুই অবস্থাতেই বুঝি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম খাটে—অর্থাৎ যেমন মানুষ পড়িতে আরম্ভ করিলে প্রতিপদপতনে তাহার পতনের গতি বৃদ্ধি হয়, বুঝি উঠিতে আরম্ভ করিলেও প্রতিপদ

উত্থানে তাহার উত্থানশক্তি বা গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শান্তি স্বামীকে বাঁচাইতে চাহে না—স্বামীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহে। এমন অপূর্ব্ব কথা, স্থির, ধীর অনুত্তেজিত অন্য কোন সতীর মুখে শুনিয়াছ কি! এইস্থলে ভ্রমরচরিত্র মনে হয়।

পাঠক, শান্তির হৃদয়াকাশে নিদাঘ কাদম্বিনী কেমন ক্রীড়া করিয়াছে তাহা দেখিয়াছ—শরৎকালীন মেঘমুক্ত দিবাকর কেমন উজ্জ্বল ছটায় চক্ষু ঝল্‌সাইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছ—এখন একবার আলোক-আঁধারময়ী মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না কেমন লীলা করে, তাহা দেখিয়া যাও। ভৈরবীপুরে স্বামিসন্নিধানে তাহার রমণীয় রমণীচরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়াছ;—আনন্দমঠে তাহার জ্বালাময়—প্রখর পৌরুষ চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এখন একবার সেই দুয়ের সংমিশ্রণ—প্রখর পৌরুষ চরিত্রে রমণীয় স্ত্রীচরিত্রের প্রভা দেখিয়া যাও।

ইংরেজসেনায় ও বৈষ্ণবস—নে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—রণস্থল শ্মশানবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। মাঘ মাস। পূর্ণিমা তিথি। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে একটী রমণী মশাল জ্বালিয়া সেই রণভূমিতে কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। রমণী একটী মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া আগ্রহ সহকারে তাহার মুখ দেখিতেছে—আবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া অন্য মৃতদেহের নিকট যাইতেছে। সে ভীষণ রণস্থলে মানুষের উপরে মানুষ পড়িয়া রহিয়াছে, অশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে। সেই রমণী যেখানে দেখিতেছে, অশ্বদেহের নীচে মানবদেহ রহিয়াছে, সেই স্থলে মশালটি মাটিতে রাখিয়া সেই

অশ্বদেহ সরাইয়া মানবদেহের মুখ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। ঐ দেখ, এইরূপ দেখিয়া দেখিয়া, দুঃখে ক্লান্তিতে অধীর হইয়া রমণী মশাল দূরে ফেলিয়া দিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? ইনিই একদিন আনন্দ-মঠে ইস্পাতের ধনুকে লোহার তারের গুণ দিয়াছিলেন! ইনিই একদিন কুঞ্জকুটীরে স্বামিসন্নিধানে কামদেবকে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছিলেন! ইনিই একদিন সত্যানন্দসমীপে বলিয়াছিলেন, 'তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না!' ইনিই সেই মহামহিমান্বিতা জ্ঞানস্বরূপিণী শান্তি। আজি কিন্তু সামান্যা মানবী। আজি মৃত পতির পার্শ্বে সামান্যা শোকাতুরা কামিনী।

দেখিলে আঁধারে আলোকে, কড়ায় মিঠায়, কেমন সুন্দর জিনিস প্রস্তুত হইল। নিরাকার চৈতন্য কেমন সুন্দর রক্ত-মাংসের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাই কবির সৃষ্টি।

তারপরে দেখ, মহাপুরুষের কৃপায় জীবানন্দ বাঁচিয়া উঠিলেন। শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'যুদ্ধে কাহার জয় হইল?'

শান্তি বলিল 'তোমারই জয় এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।'

জীবানন্দ বলিলেন 'শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইব বল। এই সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।'

"শান্তি বলিল 'আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে

—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব!'

"জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

"শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে 'জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল,জয় হইয়াছে দেখিয়া ভাগ লইতে আসিয়াছে।'

"জী। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

"শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই, এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারী কাজ?

'জী। শান্তি তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে—সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

"শা। তা কি আমি বলিতেছি! ছি! আমরা আর গৃহী নহি, এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য

পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াই।

"জী। তার পর?

"শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয় সেই বর মাগিব।

"তখন দুইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।"

গ্রন্থকার লিখিলেন,

"হায়! আসিবে কি মা? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?"

কি উজ্জ্বল মধুর চিত্র। মুহূর্ত্তমাত্র শান্তির হৃদয়শশধর যে একখানি ক্ষুদ্র মেঘে ঢাকিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল—শান্তির হৃদয়শশধর সেই পূর্ণিমার রাত্রিতে তেমনই তর তর করিয়া আনন্দের কণা সিঞ্চন করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল। এমন সুন্দর উচ্চ পবিত্র দাম্পত্য প্রেম আর কোথাও দেখিয়াছ কি? আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রিয় ভারতের ইহাই আদর্শ প্রণয়—শান্তি আধ্যাত্মিক ভারতের আদর্শ রমণী।

শান্তিচরিত্রের শেষ কথা—তাহার সেই নির্লজ্জ পৌরুষভাব। সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বলিবার আবশ্যকতা ছিল, গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ব্বপরিচয়ে তাহা বিদূরিত করিয়াছেন। পাঠক, সেই পূর্ব্বপরিচয়ই যেন আমাদের সমালোচনা—এইরূপ ভাবিয়া পড়িয়া দেখুন, কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবেন। বাঙ্গালিনী শান্তি কেমন করিয়া তেমন হইল, তাহার ব্যাখ্যা যতদূর উত্তম হইতে, পারে, হয় নাই কি?

(৩) অন্যান্য চরিতাবলী।

১। ভবানন্দ।

"আনন্দমঠ" উপন্যাসের ভবানন্দচরিত্র কিছু নূতন রকমের। গ্রন্থকারবর্ণিত আর কোন চিত্রেই এবম্বিধ আলোক ও আঁধারের তুল্য সমাবেশ নাই। আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি যে স্থূল পাপচিত্র অঙ্কনে আর্য্য কবিদিগের তাদৃশ অনুরক্তি দেখা যায় না। সেক্ষপীয়র যেমন কতকগুলি পাপচিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া, তাহার ভীষণ ও কদর্য্য অংশগুলি পাঠকবর্গকে পরিস্কাররূপে দেখাইয়াছেন, আর্য্যদেশের কোন কবি সেরূপ করিয়া পাপচরিত্র পাঠকবর্গকে পরিস্কাররূপে প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পায়েন নাই। তাঁহারা যেখানে পাপচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে প্রায়ই সে পাপকে লঘু করিয়া ভাবিবার জন্য কোন অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ তাঁহাদিগের বর্ণিত পাপচরিত্র কেবলমাত্র স্থূল পাপচরিত্র বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রতিভাসিত হয় নাই। যে সকল পাপ সূক্ষ্ম—যাহাকে পাপ বলিয়া বিবেচনা না করিবার অনুকূলেও যুক্তিতর্ক উপস্থিত করা যায়, আর্য্য গ্রন্থকার সেইরূপ পাপকেই পাপ বলিয়া চিনাইয়া দিবার জন্য যেন সেইরূপ পাপে অনুরক্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পাপ স্থূল, যাহা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ পাপ আর্য্যকবিগণের গ্রন্থে বিশেষ দেখিতে পাইবে না। যে পাপ জটিল, যে পাপ পবিত্রতার সহিত রহস্যময় হইয়া কষ্টবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, তাহাই আর্য্যকবিদিগের বর্ণনার বিষয়।

এই সম্বন্ধে দুই প্রকার মত প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

একদল বলেন—যদি পাপচরিত্র আঁকিতেই হইল, তবে তাহা নিরবচ্ছিন্ন পাপেরই মূর্ত্তি করা উচিত—যাহাতে তাহা দেখিলে তৎপ্রতি দর্শকের ঘৃণা উপস্থিত হইতে পারে, চিত্রকর তেমনই করিয়া পাপচিত্র অঙ্কন করিবেন। পাপকে পবিত্রতার সহিত মিশাইয়া চিত্র আঁকিলে তৎপ্রতি পাঠকবর্গের সহানুভূতি আকর্ষিত হইতে পারে।

অপর দল বলেন, মানবজীবনের জটিল সমস্যা ব্যাখ্যা করাই উপন্যাসকারের প্রধান লক্ষ্য। যাহাতে রহস্য নাই, তাহা চিত্র করিয়া দেখাইলে কোন লাভ নাই—অর্থাৎ যে পাপ সর্ব্বাংশেই পাপ, তাহাকে আঁকিয়া তৎপ্রতি পাঠকের ঘৃণা উৎপাদন করিতে চেষ্টা করায় বিশেষ বাহাদুরি নাই—আর তাহাতে কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে পাপকে পাপ বলিয়া চিনিতে ভ্রান্তি জন্মে, যে পাপ পবিত্রতার আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকে, তাহাকেই আলোকে আনয়ন করিয়া পাপ বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া উপন্যাসকারদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপ পাপ-প্রতি পাঠকবর্গের আভ্যন্তরিক যদি কিছু গুপ্ত সহানুভূতি থাকে তাহা প্রকাশিত করিয়া তাহার দোষগুণ তাহাদিগকে দেখান হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। যেমন শৈব-লিনীর প্রতাপাসক্তি। প্রথম দৃষ্টিতে শৈবলিনীর এই বৃত্তিতে বিশেষ কোন পাপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চরিত্র পড়ি-বার সময়ে পাঠকবর্গের মনটা বরং এই আসক্তির অনুকূলেই কিছু আকর্ষিত হয়। কিন্তু গ্রন্থকার এস্থলে ঐরূপ সহানুভূতির দোষগুণ দেখাইয়া পরিণাম বিচার দ্বারা পাঠকবর্গকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। শৈবলিনীর প্রতাপাসক্তির দোষভাগ

দেখিয়া পাঠকবর্গের গুপ্ত সহানুভূতি দূর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

এই দুই মতেরই অনুকূল ও প্রতিকূলের কথা অনেক আছে। আমরা পক্ষদ্বয়ের একটী বা দুইটী কথা বলিয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। ভবানন্দচরিত্র সম্বন্ধে এই দুই মতাবলম্বিগণের দুই প্রকার সমালোচনা আমরা পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়া ভবানন্দচরিত্র শেষ করিব।

এক দলের লোক বলেন—ভবানন্দচরিত্র এরূপ করিয়া আঁকিয়া দেখান ভাল হয় নাই। ভবানন্দ যেমন তেমন একজন লোক নহেন—সত্যানন্দের আনন্দমঠে জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, তিন জনই প্রধান অধিনায়ক। জ্ঞানানন্দকে গ্রন্থকার কথাতেই বড় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার কোন কার্য্য আমরা দেখিতে পাই নাই। জীবানন্দ ও ভবানন্দকে গ্রন্থকার কার্য্যেও বড় দেখাইয়া গিয়াছেন। ভবানন্দকে যে দিন আমরা প্রথম দেখিলাম, তাঁহার বলবিক্রম, তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সর্ব্বোপরি তাঁহার দেশভক্তি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের অতি পবিত্র স্থানে আসন প্রদান করিলাম। এই ভবানন্দের কণ্ঠেই আমরা সর্ব্ব প্রথমে আনন্দমঠের অস্থিমজ্জাস্বরূপিণী সেই স্বদেশভক্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমরা ভবানন্দকে কোথায় স্থান দিয়াছিলাম? সেই সঙ্গীত, সেই দেশভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা তাঁহাকে কি দেবতা মনে করি নাই? কিন্তু সেই ভবানন্দকে আমরা "সেই পতিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, প্রদীপ্ত শয়ান স্ত্রীমূর্ত্তি"

—সন্নিধানে কি ভাবিতে দেখিলাম ? দেখিলাম, ভবানন্দ মনে মনে কহিতেছেন—"এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব।"*

তার পর, এই ভবানন্দকেই আর একদিন দেখিলাম, মহেন্দ্রের পত্নী কল্যাণীর রূপ ভাবিতেছে। সেই রূপ কিরূপ তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইতেছিল, গ্রন্থকার তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা দ্বারা অতি পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন।

"ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণকুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারিভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তারপর যেমন করিয়া, শরন্মেঘ-বিলুপ্ত-চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা!"

এখানেও শেষ হইল না—এই ভবানন্দকেই আর একদিন কল্যাণীর সঙ্গে যেরূপ কথোপকথন করিতে শুনিয়াছিলাম, তাহা তোমরা মনে কর। আমরা রুচির অনুরোধে তাহা

* বৃহদক্ষরে আমরাই মুদ্রিত করিয়াছি।

সম্যক্ বিবৃত করিব না। তবে এক স্থানের কথা উদ্ধৃত করিয়া শুনাইব। শুন—কল্যাণী ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে ?' ভবানন্দ বলিল,

"তোমার *জন্য*। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অসংযত। সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, *তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ*। যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না, যে সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুণে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজ চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে ?"

ক্রমে মাত্রা চড়িল। দেখ সেই ভবানন্দ ধীরানন্দকে বলিতেছে, "তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি ?" "আইস তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে ?"

রি ?

এই রূপ পাপের চরিত্রে, অমন স্বদেশভক্তি, অন্যথা পবিত্রতা প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকার সুনীতি প্রচার করেন নাই। ভবানন্দ-চরিত্র "আনন্দ মঠ" উপন্যাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। এ হেন চরিত্র উপলক্ষে গ্রন্থকার আবার লিখিয়াছেন—

'হায় রমণী রূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্!"

অপর দলের লোকেরা বলেন—

যাঁহারা এইরূপ সমালোচনা করে, তাঁহাদিগের কাব্য পাঠ করা উচিত নহে। তাঁহারা দারুময়, প্রস্তরময় বা মৃণ্ময় মানব লইয়া গঠিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন, হিতোপদেশ পড়ুন, সাংখ্য-দর্শন পড়ুন, কাব্য পড়িতে আসিবেন না। কাব্য রক্তমাংসের মানুষ লইয়া—কাব্য আলোক ও ছায়া লইয়া—কাব্য দিন ও রাত্রি লইয়া—কাব্য পাপ ও পুণ্য লইয়া—কাব্য সুখ ও দুঃখ লইয়া। ভবানন্দচরিত্র জীবন্ত চরিত্র। এমন চরিত্র বঙ্কিম বাবুর অন্য কাব্যেও নাই। সমাজে কি দেখিতে পাও? যাঁহার স্বভাবে একটা কলঙ্ক থাকে, সে কি অন্য গুণে বিভূষিত থাকিতে পারে না? অধিকাংশস্থলে তাহাই কি থাকে না!

তোমরা যে সমাজের অনুবর্ত্তী, তাহার প্রতিষ্ঠাতার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তাহার সেই এক দোষ ছিল বলিয়া, কই তাঁহাকে ত কেহ এখনও অসম্মান করিতেছে না। ভবানন্দচরিত্রের দোষভাগই দেখিলে, তাঁহাতে যে মহৎগুণ ছিল, তাহা একবার দেখিলে না? ভবানন্দের বলবিক্রম, শৌর্য্যসাহস, বুদ্ধি-বাগ্মিতার কথা বিশেষ বলিব না, দেখিয়াছি সে দিকে তোমাদিগের মন আকৃষ্ট হইয়াছে—আর তাহা এত উজ্জ্বল, যে নিতান্ত চক্ষুহীন ব্যতীত [illegible] সে দিকে দৃষ্টি পড়িবে। আমরা তাহার অন্যগু[illegible] কথা বলিব।

ক্ষুদ্রগুণ হইতে আরম্ভ করি।

দেখ, ভবানন্দ কল্যাণীর রূপে মুগ্ধ, তাঁহার মিলনাভিলাষী। এরূপ স্থলে, কল্যাণীর স্বামী মহেন্দ্রের সহিত তাহার একটু

প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক। এ কথাটা বেশী নাই বা বুঝাইলাম। কিন্তু ঐ শুন, ভবানন্দ সেই মহেন্দ্র সম্বন্ধে কল্যাণীর নিকট কি বলিতেছে—যখন কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহেন্দ্র কি কাজ করিতেছেন, ভবানন্দ বলিলেন,

'যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্রনির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তান মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।'

এ কি উদারতা নহে? এ কি হৃদয়ের মহত্ত্ব নহে? আবার দেখ, কল্যাণী যখন বলিল—

'তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই একনিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?'।

ভবানন্দ বলিলেন—

'এ কথা সত্য।'

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার **একমাত্র*** প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। **নিশ্চিত মরিব।**

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। **তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত, কেন না আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।**

---

*যাহা বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত হইল, তাহা আমরাই করিলাম।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

"ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিলেন, 'দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?'

"কল্যাণী বলিল, 'রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।"

ভবানন্দ বিদায় হইল।

এই কথোপকথনের এই (বৃহদক্ষরে মুদ্রিত) কথাগুলি একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি—ভবানন্দ কেমন লোক, বুঝিতে পাইবে। একদিন এক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় একটা অধর্ম্মের জ্বালা তাহার হৃদয় ঝল্সাইয়াছিল বলিয়া, কি তাঁহাকে ঘৃণা করিবে? দেখ, ভবানন্দ সেই আগুণে পুড়িতে পুড়িতেও কেমন স্থির, কেমন ধীর। ভবানন্দের অভিলাষ পূর্ণ হইল না বলিয়া, ভবানন্দ ইতর শ্রেণীর ইন্দ্রিয়পরের মত কোন প্রকার অন্য মতলব মনে আঁটিল না, কল্যাণীর কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইল।

তার পরে ধীরানন্দকে মারিতে চাহিবার কথাটা। তোমরা এক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছ, আমরা অপর অংশ উদ্ধৃত করি, তার পরে বিচার হউক।

ধীরানন্দ বলিতেছেন—

'আমি এই বলিতেছিলাম;—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

'যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথী জলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে,—দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব!'

"এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,

'ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না, কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল। পুণ্যময়ী অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্ম্মে হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে!'

তোমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হও—সেই ওলিভার ক্রমওয়েলের পিউরিটান (Puritan) ই হও, কি যে-ই হও, আমাদের বিশ্বাস আছে যে, এই স্থলে তোমরা থামিবে—এই স্থলে একবার ভবানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। তুমি যদি (Puritan) হও, তোমাকে বলিব, স্বয়ং যিশু খ্রীষ্ট এ কথা শুনিলে বিনাবাক্যব্যয়ে ভবানন্দকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন। তুমি কিন্তু সে গৌরবের স্পর্দ্ধা কখন করিতে পারিবে না। তুমি যদি হিন্দু হও, তোমাকে

* উদ্ধৃতাংশের স্তম্ভ বা প্যারা মূলগ্রন্থে এরূপ নাই। আমরা সুবিধার্থ একটু পৃথক্ করিয়া দেখাইলাম।

বলি, জগাই মাধাই একদিন কি না করিয়াছিল? রত্নাকর একদিন কি না করিয়াছিল? ভবানন্দ যদি একদিন ইন্দ্রিয়-পরবশই হইয়া থাকেন,—একভাবে না একভাবে তাহা তোমা-দিগের কেই বা না হও—আজ তাঁহার এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না কি? ক্ষমার কথাই বা কেন বলি! পরিস্কার করিয়া. বড় গলাতেই জিজ্ঞাসা করিব, এই ভবানন্দ হইতে হইলে, যদি একদিন ইন্দ্রিয়পরবশ হইতে হয়, তবে সেটা কি স্বীকার্য্য নহে? একদিন ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া যদি ভবানন্দ হওয়া যায়,তুমি তাহা না হইতে চাহিতে পার, আমরা চাহি। যদি ভবানন্দ হইতে পারি, তবে জীবনের এক যুগ অপবিত্র জীবন কাটাইতে প্রস্তুত। এ চরিত্র অঙ্কন করিয়া গ্রন্থকার তোমাদিগের নিকট অপরাধী হইয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থ তোমরা পুড়াইয়া ফেল—লঙ্কার অমন পুরীই পুড়িল—আর এ পুড়িবে, সে আর কত বড় কথা! যে সন্দেশে মিষ্টত্ব কম—তাহা দূরে নিক্ষেপ করাই ভাল!

সর্ব্বশেষে ভবানন্দের সেই শেষ কথা মনে কর। সে স্থল হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি—

"ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন,

"তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

"ধীরা। কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি?

"এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিলেন।

"ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনাতিপাত করিতে পারিবে না!"

"ভব। কল্যাণী, তাও জান ?

"ধীর। বিবাহ কর না কেন ?

"ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

"ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

"ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

"ধীর। সন্তান ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য—আমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল। (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল)।

"ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ভব * * * *

"ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তানেরা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধ জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানধর্ম্ম অতলজলে ডুবাইয়া দাও।

"ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন, 'ধীরানন্দ যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও

বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।

এস্থলে তোমরা ভবানন্দের ঐ 'ধীরে ধীরে' তরবারি নামাইবার কথাটার উপরে একটা কথা বাঁধিবে, বুঝিতেছি। তার পরে, ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, তখন ভবানন্দের তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী না হওয়ার কথাটায়, তিনি তখন অন্যমনা ছিলেন এই কথাটায়, তোমাদের বাগ্মীতার উৎস খুলিবে; বলিবে—'দেখ ভবানন্দ এখন কেমন ইতস্ততঃ করিতেছে,—প্রলোভনের কথাটা কেমন ভাবিতেছে।' বিশেষ পূর্ব্ব সংস্করণের আনন্দমঠ খুলিয়া আরও কিছু বলিতে পার, কিন্তু যখন নিম্নের কথাগুলি পড়িবে, তখন তোমাদিগের সেই কথা দাঁড়াইবে কি? তে

"রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অ[illegible] অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষতলায় দুর্ভেদ্য, বন্যপশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার দুর্ভেদ্য, নীরব। রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়না-কারী, বধ্য এবং বধকারী, পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন—

"ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই?—(ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন।)

"ভব। না—(এই সময়ে এক জন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

"ধীর। আমার সাধ্য কি যে তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

"ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন এক হস্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, 'কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।'

"ভব। কি প্রকারে?

"ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও (ভবানন্দ, এক জন গোরা কর্ত্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন এমত সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

"ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও। বলিও আমি আমি অবিশ্বাসী নহি।

"ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে, যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, 'তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্ব্বাদবাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের কাছে থাকিও। আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে।'

"ভবানন্দ বলিলেন, 'সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি!'

"তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে 'বন্দে মাতরম্' গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

"সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে গায়িতে বিষ্ণু পদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।"

এই স্থলেই গ্রন্থকার লিখিতেছেন

'হায় রমণীরূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক।'

হে রুচিসংস্কারক নীতিতত্ত্ববিৎ সমালোচক—এ হেন ভবানন্দকে ধীরানন্দ পবিত্রাত্মা ও মহাত্মা সত্যানন্দ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির উপযুক্ত মনে করিয়াছেন, তুমি কে যে তাঁহাকে পাপী বলিয়া 'আনন্দমঠ' হইতে উঠাইয়া দিতে চাহ?

আচ্ছা, তাড়াইয়া দিতে হইলে, শেষে দিও—এখন একবার এই ভবানন্দের এই যুদ্ধ অবলোকন কর। ভবানন্দের দক্ষিণ হাত কাটা গেল, বামবাহু ছিন্ন হইল—তবু ভবানন্দ জলন্ত স্বামিশবপার্শ্বে শায়িতা সহগামিনী সতী রমণীর ন্যায় কেমন স্থির, ধীর, অচল, অটল। উহাতে কি ভবানন্দের কষ্ট হইতেছিল? কষ্ট বোধ হইবে কোন্ স্থলে? ভবানন্দের মন, তখন আনন্দপ্রপূর্ণ—তখন কষ্ট স্থান পাইবার স্থান তাহাকে ছিল না। ইহা যদি দেখিতে না চাও—একবার মৃত্যুকালে ভবানন্দের মুখে 'বন্দে মাতরম্' শুন। এখানে সেখানে, যার তার মুখে এই গান শুনিবার জন্য ত লালায়িত দেখিতে পাই, একবার ভবা-

নন্দের মুখে এই সঙ্গীতটী শুন—গান শুনিতে শুনিতে একবার তাঁহার মৃত্যু অবলোকন কর—ও কি—এই এ কি হইল—এখন যে তোমরাও গ্রন্থকারের ন্যায় প্রথমে মনে মনে, পরে বড়গলায় বলিতেছ,

'হায় রমণী রূপলাবণ্য ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্?' এই হইয়াছে। আর তোমাদিগের সহিত আমাদিগের কোন তর্ক নাই।

ইহার পরে আর একদিন প্রথমমতাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত বক্তার সহিত, দ্বিতীয় মতাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত বক্তার দেখা হইলে—১ম মতাবলম্বী বক্তা—বিশেষ আহ্লাদসহকারে দ্বিতীয় মতাবলম্বীকে বলিয়াছিলেন, "সে দিন তোমার কথার চটকে আসল ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আচ্ছা, আজ জিজ্ঞাসা করি, কি শিখাইতে ভবানন্দের সৃষ্টি হইল? ইহা দেখিয়া কি শিখিব যে, পরদার-পরায়ণ হইলেও, বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়?" অপর লোকটী হাসিয়া বলিলেন—"এ শিক্ষায় যদি তোমার একান্তই আপত্তি হয়, তুমি ভবানন্দচরিত্র দেখিয়া ইহা শিখিও, যে চন্দ্রে কলঙ্ক হইয়াছে বলিয়াই চন্দ্রদেব এত কিরণ বিকীরণ করেন। ইহা শিখিয়া বল দেখি, ইহাতে আমাদিগের লাভ না ক্ষতি?"

২। কল্যাণী।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, কল্যাণী বিসর্জ্জন। প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছি, আজি বিসর্জ্জনের কিছু পরিচয় দিব।

পাঠকবর্গ একবার আনন্দমঠ উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ মনে কর—না হয়, আমরা কিছু উদ্ধৃত করিয়া তোমাদিগের সাহায্য করিতেছি।

"অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদা কাটার পর চোখ মুছার ধূম পড়িয়া গেল। যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনু-চর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এইজন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্যফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসীঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর

নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রমদূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, 'বাড়ীতে বিপদ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।' মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন গতক্লম হইয়া কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

"কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমাকে আজি আমি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি? বিপদ যাহা তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?'

"মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।'

"ক। কেন?"

তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে যাহা যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বলিলেন। কল্যাণীও অনেক দুঃখের কথা বলিলেন, বলিলেন, তিনি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন তিনি কোন

এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছেন। "সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয়স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এতরূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ, যে আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী মূর্ত্তি! সেও জ্যোতির্ম্ময়ী; কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অতি শীর্ণা কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রী মূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া ঢেউ দিতে দিতে সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘ-মণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী

ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।' তখন আবার সেই বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।"

এই অবকাশে মেয়েটি সেই বিষের বড়ীটি মুখে দিল—কিছু কাল পরে কল্যাণী তাহা টের পাইলেন, তিনি বড়িটি মেয়ের মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

তাঁহারা মনে করিলেন, মেয়েটি বড়িটির কিছু উদরসাৎ করিয়াছে। মেয়েও কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল—ছটফট করিতে লাগিল। "তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, 'আর দেখ কি? যে পথে দেবতা ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।'"

কল্যাণী তখন সেই বিষের বড়ী মুখে দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

"মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, 'কি করিলে—কল্যাণী ও কি করিলে।' কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, 'প্রভু কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।' 'কল্যাণী কি করিলে' বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, 'আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও?'

"মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, 'তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম —আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!'

"কল্যাণী। 'কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।' এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, 'দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মরিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজনে একত্রে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।'

"এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল—তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময়ে সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি

কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

"কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছেঃ—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

"তখন কল্যাণী অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে বলিতে লাগিলেন,

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

মহেন্দ্রকে বলিলেন বল,

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'"

* * * *

"কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

"তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী 'হরে মুরারে' ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিয়াছেন।" *

* আমরা পরিচ্ছেদের প্রায় সমস্ত অংশই উদ্ধৃত করিয়াছি।

আমাদের কবি যখনই যেখানে সতী স্ত্রী আঁকিয়াছেন, সেই স্ত্রীর পতিপ্রেমে একটু ভক্তি মিশাইয়া তাহাকে আমাদিগের এতদ্দেশীয় করিয়া দেখাইয়াছেন। এই ভক্তিমিশ্রণেই তাঁহার রমণীচরিত্র এত সুন্দর ফুটিয়াছে।

যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তাহাতে কল্যাণীর প্রগাঢ় পতিপ্রেমের সহিত তাহার অচলা পতিভক্তি মিশিয়া কেমন উজ্জ্বল আভা বিকাশ করিতেছে—পাঠকবর্গ একবার চাহিয়া দেখুন।

এই কল্যাণীর সহিত শান্তির একটা সম্বন্ধ আছে। শান্তি ও কল্যাণী উভয়েই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ভাব দেখাইতেছেন—উভয়েই স্বামীর ব্রতপালনে সহায়তা করিয়াছেন—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। শান্তি স্বামীর ব্রত পালনে সহায়তা করিয়াছেন, জীবানন্দের কাছে থাকিয়া—কল্যাণী স্বামীর ব্রতপালনে সহায়তা করিতেছেন, স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া। শান্তি করিয়াছেন স্বামিপ্রতিষ্ঠা—কল্যাণী করিয়াছেন স্বামিবিসর্জ্জন।

৩। ৪। জীবানন্দ—মহেন্দ্র।

এই চরিত্র দুইটী বড় পরিস্কার—ইহাতে বেশী বলিবার কিছুই নাই। তবে একটী মাত্র কথা আমরা বলিব।

ইহার কতক বর্ণনাচাতুর্য্য দেখাইবার সময়ে উদ্ধৃত করিতে হইত—কতক অন্য প্রয়োজনে উদ্ধৃত করিতে হইত, সেই জন্য এই স্থলেই সকল উদ্ধৃত করিয়া লইলাম। আমাদিগের এই সমালোচনা, গ্রন্থ নিকটে না রাখিয়া যাহাতে পাঠ্য হইতে পারে, আমরা তজ্জন্য পূর্ব্বাবধি চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি—অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করার ইহাও অন্যতম কারণ।

জীবানন্দ ও মহেন্দ্র উভয়েই উৎকৃষ্ট সহধর্ম্মিণীর স্বামী। শান্তি ও কল্যাণী উভয়েই যেরূপ রূপবতী, তেমনই পতিপরায়ণা। একদিন এই স্ত্রীর জন্য উভয়েই কর্ত্তব্যধর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছিলেন। জীবানন্দ একদিন নিমাইর বাড়ীতে শান্তিকে দেখিয়া সন্তানধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবার কথা বলিয়াছিলেন—মহেন্দ্র একদিন এই স্ত্রী ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণে অন্যথা প্রস্তুত হইয়াও বলিয়াছিলেন—'আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।' উভয়েই এই সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক ধর্ম্মপালনে প্রোৎসাহিত—উভয়েই সন্তানশ্রেষ্ঠ।

তবু মহেন্দ্র ও জীবানন্দে প্রভেদ বিস্তর। জীবানন্দচরিত্রে যত ঘাতপ্রতিঘাত দেখিয়াছি—মহেন্দ্রচরিত্রে সেরূপ ঘাত-প্রতিঘাত দেখি নাই। যতদিন জীবানন্দ শান্তিকে নিমাইর বাড়ী রাখিয়া আসিয়া স্বীয় সন্তানধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহার চিত্তে বোধ হয় সময়ে সময়ে ঘাতপ্রতিঘাত হইত। শান্তির ন্যায় পত্নীকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করিয়া পাপাচরণ করিয়াছেন বলিয়া জীবানন্দকে সময়ে সময়ে অবশ্যই ইতস্ততঃ করিতে হইত। তার পরে শান্তিকে সঙ্গে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই কি বড় সহজ কথা। একদিন জীবানন্দের একটু ধৈর্য্যস্খলন দেখিয়াছি বলিয়াই, তাহাকে সামান্য মানব মনে করা যায় না—জীবানন্দ চরিত্রবীর!

মহেন্দ্রের চরিত্রে এমন ঘাতপ্রতিঘাত নাই। মহেন্দ্র কল্যাণীকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই—যদিও একবার সে সংকল্প করিয়াছিল, তবু যেমন দেখিয়াছি, বোধ হয় কল্যাণীকে মৃত মনে না করিলে, সে সে সংকল্প স্থির রাখিতে পারিত না।

তার পরে মহেন্দ্র যতদিন সন্তানধর্ম্ম পালন করিয়াছে—কল্যাণীকে মৃত বলিয়া জানিয়াই করিয়াছে। কল্যাণীবিরহ তাঁহাকে বরং ধর্ম্মপালনে প্রোৎসাহিতই করিয়াছে। সুতরাং, মহেন্দ্রচরিত্র নির্দ্দোষ হইলেও, তাহাকে জীবানন্দচরিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠচরিত্র বলা যায় না। তবে মহেন্দ্রকে ভাগ্যবান্ সংসারী, জীবানন্দকে ভাগ্যবান সন্ন্যাসী বলিতে পারা যায়।

। নিমাই।

কপালকুণ্ডলায় যেমন শ্যামাসুন্দরী দুই এক দিনের দুই একটী কথাতেই আমাদিগের মানসক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণে বিরাজিত রহিয়াছেন—এই আনন্দমঠে নিমাইমণিও সেই রূপই দুই এক দিনের দুই এক কথাতেই আমাদিগের স্মৃতিপটে অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত রহিয়াছেন।

নিমাইর একদিনকার ব্যবহার বা পরিচয় এইরূপঃ—

জীবানন্দ কল্যাণীর কন্যা সুকুমারীকে লইয়া নিমাইর বাড়ীতে গেলেন। নিমাইর বাড়ীতে একটা চরকা ছিল—জীবানন্দ সেই চরকায় শব্দ করিতে লাগিলেন। চরকার শব্দ শুনিয়া সুকুমারী বড় কাঁদিয়া উঠিল। তখন নিমাইমণি ঘর হইতে বাহির হইল, বাহির হইয়াই—"দক্ষিণগণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল 'এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে ক'রেছ না কি?"

পরে জীবানন্দ যখন মেয়েটিকে নিমাইমণির নিকট দুধ খাওয়াইতে দিলেন—

"নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে

শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোটাকতক জল পড়িল। তাহার একটী ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—

'হ্যাঁ দাদা কার মেয়ে দাদা?'

জীবানন্দ বলিলেন, 'তোর কিরে পোড়ারমুখী?'

নিমি বলিল, 'আমায় মেয়েটী দেবে?'

জীবানন্দ বলিল, 'তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি।'

নিমি। 'আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—' "বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার *আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে আবার হাসে।"*

জীবানন্দ বলিল, 'তুই নিয়ে কি কর্‌বি? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।'

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটী দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মর্‌গে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটী কায়েতের মেয়ে, আমি চল্‌লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটী খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটী খাব? দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটী ভাত দে।

"নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

"নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকা-ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দাল্না, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

'নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি?'

"নিমি বলিল, 'মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটী মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপ-নারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।'

জীবানন্দ বলিল, 'বোনাই কোথা?'

"নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, 'সেই দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে না কি চাল চেয়েছে?'

"এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপ-নার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জন গুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক

বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, 'দাদা আর কিছু খাবে ?'

জীবানন্দ বলিল, 'আর কি আছে ?'

"নিমাইমণি বলিল, 'একটা পাকা কাঁটাল আছে।'

"নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটীকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল,

'দাদা আর কিছু নাই।'

দাদা বলিলেন, 'তবে যা। আর এক দিন আসিয়া খাইব।'

"অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, 'দাদা, আমার একটী কথা রাখিবে ?'

জীবা। কি ?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল্‌না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখবে ?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল ?

"নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙ্গুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটীপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, 'একবার বউকে ডাক্‌বো ?'

"জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, 'আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস্।'

নিমাই বলিল, 'তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী একবার বৌকে ডাক্‌বো?'

জীবা। 'আমি চল্লুম।' "এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়,—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, 'আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পার্‌বে না।'"

"জীবানন্দ বলিল, 'আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি তা তুই জানিস্?'

"এইবার নিমি রাগ করিল, 'বলিল, বড় কীর্ত্তিই করেছ স্ত্রীত্যাগ কর্‌বে, লোক মার্‌বে, আমি তোমায় ভয় কর্‌বো! তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।'

"জীবানন্দ হাসিল, 'ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ ফের যদি এমন কথা বলবি, তোকে কিছু বলি না বলি সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার্ করে দিব।'

"নিমি মনে মনে বলিল, 'আমিও তা হলে বাঁচি।' এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী

এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতে ছিল। নিমাই গিয়া বলিল, 'বৌ শিগ্‌গির শিগ্‌গির!' বৌ বলিল, 'শিগ্‌গির কি লো! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে না কি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?'

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

"সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাথাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, 'তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।' সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল,'কি লো তুই কি খেপেছিস্ নাকি?'

"নিমাই দুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, 'শাড়ী বের কর।'

"রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল।

* * * *

বলিল, 'কি লো নিমি, কি হইবে?' নিমাই বলিল, 'তুই পর্‌বি?' সে বলিল, 'আমি পরিলে কি হইবে? তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, 'দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।' সে বলিল, 'আমায় যেতে বলেছেন! ত ঢাকাই শাড়ী কেন, চল না এমনি যাই।' নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, 'চল এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।' কিছুতেই

কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।"

আর এক দিন দেখ:—

"জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে,একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল,

'তবু ত দেখা হলো।'

"শান্তি কিছুই উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভাল বাসে না, তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল,

'দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটী।'

শান্তি বলিল,

'মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো?'

নিমি। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

"নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। 'দাদার মেয়ে' অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটী পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল,

'আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।'

"নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

'কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার তো অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল—তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয়?' (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

'মেয়েটী দিব্য সুন্দর, নাদুস নুদুস চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি'

এই উদ্ধৃত অংশ ৬।৭ পৃষ্ঠা হইবে। কিন্তু এই ৬।৭ পৃষ্ঠাতেই একটী সজীব মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা সত্যমূলক (Real) উপন্যাস দেখিতে ভাল বাসেন, এবং বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে সেই সত্য (Realty) কম আছে বলিয়া, যাঁহারা "স্বর্ণলতা" উপন্যাসকে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস হইতে উৎকৃষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই ৬।৭ পাতার উপন্যাস পাঠ করুন—দেখিবেন কি সুন্দর স্বাভাবিক চিত্র।

এই কয়েক পাতা পড়িতে পড়িতে আমাদের চক্ষের উপর যেন নিমাইর চেহারাটি শুদ্ধ প্রতিফলিত হইতেছে। আমরা যেন দেখিতেছি, গৃহস্থিত চরকার শব্দ ও শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ১৭।১৮ বৎসরের একটী শ্যামাঙ্গী খর্ব্বাকৃতা ঈষৎ স্থূলকায় রমণী বাহিরে আসিয়া দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি

সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দের যতক্ষণ অন্যদিকে দৃষ্টি ছিল, ততক্ষণই যেন নিমাই এই ভাবে রহিল। পরে জীবানন্দের দৃষ্টি নিমাইর দিকে পতিত হইবামাত্র যেন নিমাইমণি একশ্বাসে 'এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথায় পেলে? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি— আবার বিয়ে করেছ না কি'—এই কয়েকটী প্রশ্ন করিল। তারপরে যখন নিমি দুধ খাওয়াইতে বসিল, আমরা তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—দেখিলাম, দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে নিমি ফোটা কতক চক্ষের জল ফেলিল—কারণ সেই দুধ খাওয়াইতে বসিয়া তাহার সেই মৃত পুত্রকে মনে পড়িল—বিশেষ সে যে ঝিনুক লইয়া দুধ খাওয়াইতেছিল, তাহা সেই ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার ঝিনুক। নিমি যখন হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ দাদা কার মেয়ে দাদা"—তখন নিমির অন্তস্থল পর্য্যন্ত যেন আমরা দেখিতে পাইলাম। গ্রন্থকার যেন নূতন বৈজ্ঞানিক আলোক (X rays) জ্বালিলেন—নিমির হৃদয়ের লুক্কায়িত পুত্রস্নেহ—সেই স্নেহের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিবার জন্য নিমাইর সেই চেষ্টা যেন আমাদিগের চক্ষে উজ্জ্বল বর্ণে প্রভাসিত হইল। জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি!' "তখন নিমাইমণি বলিল 'আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব'—গ্রন্থকার লিখিলেন, 'বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে আবার হাসে।' পাঠক দেখিলে এ আলোকের ছটা! নিমাইর হৃদয়ের কপাটখানি যেন গ্রন্থকার খুলিয়া

দেখাইলেন। বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথাগুলিতে নিমাইকে কি সুন্দর ফুটাইয়াছে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ—শত পাতা লিখিলেই কি কাব্য ভাল হয়?

এতক্ষণ তাহার ক্ষুদ্র নবীন হৃদয়ে নবীন পুত্রস্নেহ বা পুত্র-শোক দেখিয়াছ, এক্ষণে সেই হৃদয়খানির ভ্রাতৃস্নেহ একবার দেখিয়া লও। সেই যাহা পড়িয়াছ, তাহাতেও সে স্নেহের দৃষ্টি না রহিয়াছে, এমন নহে—নিমাইমণি দাদার নিকটে যাহা বলিয়াছে, তাহাতেই তাহার হৃদয়ের ভ্রাতৃস্নেহ ফুটিয়াছে—তাহার সেই "দাদা" সম্বোধন যেন আমাদের কর্ণে এখনও ধ্বনিত হইতেছে। পরে যখন নিমাই দাদাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল, বলিল 'সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটী খেয়ে যাও।' আমরা যেন দেখিলাম আমাদিগের কনিষ্ঠা সহোদরা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ভোজ-নের জন্য অনুরোধ করিতেছে। পরে নিমাই যেমন করিয়া জীবানন্দকে খাওয়াইল, তাহাতে আমরাও যেন জীবানন্দের সহিত মূর্ত্তিমতী ভগিনীর ভালবাসা মিশ্রিত সেই অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলাম।

তারপরে দেখ—নিমাইর আর এক প্রকারের হৃদয়ের বৃত্তি। নিমাই তাহার দাদাকে বলিতেছে—'দাদা আমার একটী কথা রাখিবে?' জীবানন্দ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি বল,'

"নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের অঙ্গুলি টিপিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া

একবার মাটী পানে চাহিল। শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল 'একবার বউকে ডাক্‌বো?'

গ্রন্থকারের লেখনীসঞ্চালনে যেন বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠে—তাহাতে যেন অতি অন্ধকারাবৃত স্থানগুলিও আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই নিমাইর এই ভাব যেন আমরা কোথাও দেখিয়াছি, তাহাই মনে হয়। 'দাদা একবার বউকে ডাক্‌বো?' এ কথা যেন আমাদেরই ভগিনী আমাদের কাছে বলিতেছে।

তার পরে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আর এক প্রকারের উচ্ছ্বাস দেখ। নিমাই নাছোড়বন্দা। তাহাব ভ্রাতৃস্নেহ, তাহার ভ্রাতৃজায়া প্রতি ভালবাসা, তাহার রমণীসুলভ মিলনদর্শনেচ্ছা একত্র হইয়া তাহার হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠাইল। সেই উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিমাই দাদার নিকট আবদার ধরিল—বৌয়ের সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে—দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল 'আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।' জীবানন্দ বলিলেন 'আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্?' নিমি রাগ করিয়া ইহার যে উত্তর করিল, তাহাতে তাহার রমণীয় রমণীহৃদয় যেন মিশিয়া আসিল। এ সব এমন সুন্দর এমন স্বাভাবিক যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তারপরে দেখ—নিমি শান্তিকে সাজ গোজ পরাইবার জন্য মহা ব্যতিব্যস্ত—দাদার কাছে বৌ যাবে—এমন বেশে কি যাওয়া যায়? সেই বা কেমন সুন্দর, কেমন স্বাভাবিক।

আর একদিনকার নিমাইকে দেখ। সেই যে দিন নিমাই

মেয়ে কোলে করিয়া শান্তির নিকটে বসিয়া তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল—'তবু ত দেখা হলো।' সেই কেমন সান্ত্বনার কথা, কেমন সহানুভূতির কথা! তারপরে মেয়েটী লইয়া শান্তির সহিত তাহার একটু রসালাপও হইল। পরে যখন গ্রন্থকার লিখিলেন,

"আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল—'মেয়েটি দিব্য সুন্দর নাদুস্ নুদুস্ চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।'"

তখন যেন আমরা দেখিলাম, নিমাই চোখে জল লইয়া মেয়েটি দুই হাতে ধরিয়া নাচাইতেছে বা পিঠ চাপড়াইতেছে আর বলিতেছে—'মেয়েটি দিব্য নাদুস্ নুদুস্'—আমরা যেন দেখিলাম নিমাই এই কথাগুলি বলিয়া সেই মেয়েটীর মুখচুম্বন করিল ও আবার চক্ষের জল মুছিল।

তারপরে যে দিন নিমাইর নিকট হইতে জীবানন্দ মেয়ে আনিতে গেলেন, সে দিনকার নিমাইর বর্ণনা একমুখে ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁহারা মনে করেন, গ্রন্থকার স্বাভাবিক ঘটনা সজীব করিয়া বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা এই লাইন কয়েক পড়িয়া সেই ভ্রম দূর করুন এমন স্বাভাবিক ব্যাপারের সজীব বর্ণনা অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

"জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

"তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তার পর একবার নার ঠোট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল 'আমি মেয়ে দিব না।'

"নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, 'তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও তো নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।'

"নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?' নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল 'হাঁ মা—কোথায় যাব মা?' নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।"

এখন দেখ, এই কয়েক পাতার বর্ণনায় কেমন বিচিত্র ভাবপূর্ণ একটী সজীব চরিত্র সৃষ্ট হইল। যদি স্বাভাবিক ব্যাপারের সজীব বর্ণনাতেই বেশী বাহাদুরী থাকে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, এমন বাহাদুরী বাঙ্গালায় আর কোন পুস্তকেই নাই। সেই কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরীও নিমাইর নিকট নিষ্প্রভ—দুই চারিটী রেখাপাতে এমন সজীব চিত্র অঙ্কন বঙ্কিম বাবুরও অন্য পুস্তকে নাই।

ভাষা—বর্ণনা।

"আনন্দমঠ" উপন্যাসের বর্ণনা বড়ই মনোহারিণী। সরল ভাষায় সুমধুর বর্ণনা বঙ্কিম বাবুর অন্য গ্রন্থেও এমন আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে ভাষা ও বিষয়দৃষ্টি বর্ণনার প্রাণ, তাহাতে বঙ্কিম বাবু পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। দুই একটী উদাহরণ দেখাইয়া কথাটি প্রতিপন্ন করিতেছি।

প্রথমে দেখ, ১১৭৪ সালের সেই দুর্ভিক্ষবর্ণনা। আমরা স্থানান্তরে * সেই বর্ণনার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই বর্ণনা যেন সহস্র মুখ হইয়া সরল কথায় ১১৭৪ সালের সেই দুর্ভিক্ষটী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে। বর্ণনার বাহাদুরি দেখ—বেশী বড় কথা নাই—বেশী অলঙ্কারেরও সমাবেশ নাই। সহজ কথায়, সরলভাবে সেই দুভিক্ষের কথাটা যেন আমাদিগের প্রাণে গাঁথিয়া দিতেছে। এইরূপ আর একটী বর্ণনা তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে আছে। সেটা ৭৬ সালের বর্ণনা। অনেকে মনে করেন যে, সরল ভাষায়, বিনা শব্দাড়ম্বরে বাগ্মিতা প্রকাশ করা যায় না। তাহাদিগকে একবার আনন্দমঠের মহেন্দ্রসিংহের সহিত ভবানন্দের কথোপকথন পড়িতে অনুরোধ করি। ভবানন্দ বলিতেছেন,

---

* ৫ পৃষ্ঠা দেখ।

"মহেন্দ্রসিংহ তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা। কেবল দুধ ঘির যম। দেখ সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহার অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্ধুকে টাকা রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে শোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখনত প্রাণপর্য্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?"

বাগ্মিতা আর কাহাকে বলে? কথাগুলি যেন স্তরে স্তরে উঠিয়া মহেন্দ্রসিংহের অস্থিমজ্জাগত হইয়া তাহার নির্জ্জীব ধমনীতে উৎসাহশোণিত বহাইয়া দিতেছে। এইরূপ ভাষার স্রোত আর একস্থলেও বড় সুন্দর প্রবাহিত হইয়াছে।

"তখন মঠের ধারে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন 'আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া অজয়ের জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড়

আগুণে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার জন্য শরীরপাতনপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদেয় তরবারে কি ধার নাই?' হস্ত প্রসারণ করিয়া, জ্ঞানানন্দ বলিলেন, 'এ বাহুতে কি বল নাই?'—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে!—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া অজয়ে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড় কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'"

যেখানে বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানেও তিনি সেই বর্ণনা অতি সুমধুর করিয়াছেন। আনন্দমঠের সেই স্থাপিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বর্ণনা দেখ।*

* ১১—১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ফলতঃ "আনন্দমঠ" উপন্যাসের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রায় সরলতা ও প্রসাদগুণশালিনী।

তার পর দেখ বর্ণনার দৃষ্টি। বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয় প্রতি বঙ্কিম বাবুর যেমন দৃষ্টি, সেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইতে উপমা দিবার জন্য অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সেইরূপই দৃষ্টি। দুইচারিটি উদাহরণ দিয়া কথাটা প্রতিপন্ন করিতেছি।

সুকুমারীর বিষ খাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর, দেখ গ্রন্থকার তাহা কেমন বর্ণনা করিয়াছেন।

"সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটী পড়িয়া গেল।

"বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল। মনে করিল এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

"কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তি মাত্রেণ ভোক্তব্য—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।"

নিমাইমণির চরিত্র দেখাইতে এরূপ অনেক বর্ণনা দেখিতে পাইবে। আরও দুই একটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। গ্রন্থকার গৌরী ঠানদিদির বর্ণনা করিতেছেন,

"স্ত্রী লোকটী অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা কালো কোলো, ঠোঁট

পরা, কপালে উল্কি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্ ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখ-ভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানাপ্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে।”

ইহাতে দেখিলাম—বর্ণিত বিষয় প্রতি গ্রন্থকারের সূক্ষ্মদৃষ্টি। বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, এমন বর্ণনা কবির হয় না।

তার পরে দেখ বঙ্কিম বাবুর উপমা। স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য যেমনই সংসারে অপূর্ব্ব—সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর বর্ণনাও তেমনই কাব্যে অপূর্ব্ব।

শান্তির সেই রূপবর্ণনা মনে কর। দেখ কি সুন্দর উপমা দ্বারা কি সুন্দর বর্ণনা হইয়াছে। আরও কয়েকটি এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

“সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন কোথায় গোলাপজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধুপ ধূনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল।”

অন্যত্র—কল্যাণী মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ন করিয়া আছেন, সেই রূপবর্ণনা দেখ।*

---

* ৭২ পৃষ্ঠা দেখ।

অন্যত্র কল্যাণীর রূপবর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন,

"একটী ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকা-শ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণীতাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্বমত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বন্যলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ইহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয় সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্ত দেবী।"

বঙ্কিম বাবুর যুদ্ধবর্ণনা বড়ই সুন্দর। সেই যুদ্ধে সেনাপতিগণের উৎসাহবাক্য, তাহাদিগের আত্মত্যাগের বর্ণনাগুলিও

বড়ই মনোহারিণী। প্রস্তাববাহুল্যভয়ে আর তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না।

তার পরে বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির একতা-ব্যঞ্জক বর্ণনাও আনন্দমঠে অভাব নাই।

প্রথমে উপক্রমণিকা দেখ।

পরে ভবানন্দের সেই রাত্রির বর্ণনা মনে কর।*

"আনন্দমঠ" উপন্যাসে বঙ্কিম বাবুর রসভাষণেরও অভাব নাই। শান্তি কাপ্তেন টমাসের সহিত যেরূপ রসালাপ করিয়াছিল—বৈষ্ণবী সাজিয়া এড্‌ওয়ার্ডসের সঙ্গে যেরূপ কৌতুক করিয়াছিল, তাহা বলিব না, তাহাতে ভাষার সম্বন্ধে বক্তব্য বড় কিছু নাই। যেস্থলে বঙ্কিমবাবু ভাষা লইয়াই কৌতুক করিয়াছেন —ভাষাকেই হাস্যযুক্ত করিয়া আমাদিগকে আমোদিত করিয়াছেন, তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দিব। এ দৃষ্টান্ত আমরা বাছিয়া দিলাম না।

"ঠাকুরুন দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না, কেন না সকড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায় তাহাতে পূজার সময় একটী বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল, তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না, কেন না ঠাকুরুণটী একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে

---

* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরম ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণীর কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন 'কে গোসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?'"

তার পরে সেই অতুলনীয় সঙ্গীতটীর কথা মনে কর—সেই 'বন্দে মাতরম' মনে কর, তাহা হইলেই ভাষাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইবে।

ঘটনা।

এই ঘটনাবর্ণনাতে বঙ্কিম বাবু অনেক স্থলে স্বাভাবিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই কথা এক দল লোকে বলিয়া থাকেন। এ কথাটি আমরা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে আমরা ইহাই বলিব যে, এই ঘটনাবর্ণনা তাঁহার নিকট অতি আনুষঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভাবই তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়—তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—ঘটনার প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই।

যেমন দেখ, শান্তি শিক্ষা ও সংসর্গগুণে কিছু পৌরুষভাবাপন্ন হইয়াছিল। গ্রন্থকার এই ভাবটি দেখাইবার জন্য কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। তোমরা সে সকল

ঘটনাকে অস্বাভাবিক এই অর্থে বলিতে পার যে, উহা সচরাচর ঘটে না। কিন্তু তোমরা ইহা বলিতে পারিবে না যে, শান্তির মনোবৃত্তির সহিত সেই ঘটনার মিলন নাই—সেই সকল ঘটনায় শান্তির পৌরুষভাব ফুটে নাই। ভাবিয়া দেখিলে, এই যে অস্বাভাবিকতা, ইহা মূলের অস্বাভাবিকতা নহে—ইহা যে ঘটিতেই পারে না—এমন প্রমাণ করা যায় না। তবে এরূপ ঘটিতে কোথাও দেখি নাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। এ সম্বন্ধে নানাস্থানে অনেক কথা বলা হইয়াছে * পুনরায় আর বলিতে ইচ্ছা নাই।

ঘটনায় একটু রহস্য বা জটিলতা থাকিলেই, ভাল হয়। আনন্দমঠে এইরূপ রহস্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ যথেষ্ট আছে। দুই একটী এইরূপ ঘটনার পরিচয় দিতেছি।

১ম। উপক্রমণিকার ঘটনা। সত্যানন্দের সেই সাধনা—সেই উত্তর—সবই রহস্যময়। এ ঘটনার রহস্যভেদ দেখিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হয়। আবার ঘটনাটিও বেশ গম্ভীরভাব যুক্ত—যাহাকে ইংরেজীতে Grand বলে তাহাই।

২য়। কল্যাণীর দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ঘটনা। এটিও রহস্যপূর্ণ—তার পরে কল্যাণীর সেই পলায়নের সময়ে সেই অন্তরীক্ষের গান—সেই শুভ্রকেশ শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তির আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তেমনই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ—যেমনই Grand তেমনই Beautiful.

৩য়। আনন্দমঠের সন্তানগণের কারবার। সেও বিস্ময়-

* বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমভাগ দেখ।

কর ব্যাপার—তাহাও রহস্যপূর্ণ—তাহারও রহস্য উদ্ভেদে মন স্বতঃই কৌতূহলী হয়।

৪র্থ। মহেন্দ্র ও ভবানন্দের ধৃত হওয়ার ঘটনা—তাহাদিগের মুক্তি, সবই কৌতূহলজনক—অথচ বিস্ময়কর। বিশেষ অস্বাভাবিকও নহে।

৫ম। কল্যাণীর স্বপ্ন। বড়ই Grand গম্ভীরভাবপূর্ণ। রহস্যময়, কিছু অমানুষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যায়, উহা সত্যানন্দ ঠাকুরেরই কৌশল। সত্যানন্দ ভবানন্দের এ সম্বন্ধের কথোপকথন পড়িলে, এই রূপই সন্দেহ হয়। কিন্তু এ কথা ভাল করিয়া না বুঝিয়া সত্যানন্দকে আক্রমণ করিতে পারা যায় না।

৬ষ্ঠ। মহেন্দ্রের কারামুক্তি। সে ঘটনা এত বিস্ময়কর যে, মহেন্দ্র তাহা দৈব ব্যাপার বলিয়াই বুঝিতে বাধ্য হইয়াছিল। একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এ সব স্থলে সত্যানন্দের বুদ্ধিবলই অন্যের নিকট দৈববল বলিয়া বিবেচিত হইত।

৭ম। কল্যাণীর জীবন প্রাপ্তি। ইহাও রহস্যপূর্ণ, অথচ অস্বাভাবিকও নহে। এখনও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বন্য ঔষধাদি দ্বারা অন্যের অসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া তুলেন। ভবানন্দের সেরূপ ঔষধ জানা কিছু অমানুষ ব্যাপার নহে।

কত আর দেখাইব! আনন্দমঠ এরূপ রহস্যপূর্ণ ঘটনায় পূর্ণ হওয়াতে কাব্যাংশে সাধারণের নিকট কম সম্মান লাভ করে নাই।

ইতিবৃত্ত।

বাঙ্গালা ১২৮৮ সালে "আনন্দমঠ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কতকাংশ পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্ত ইহার ৫টি সংস্করণ হইয়াছে। এই ৫ম সংস্করণে গ্রন্থখানি বড়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান স্ত্রীচরিত্র 'শান্তি' সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা নূতন লিখিত হইয়াছে—ভবানন্দচরিত্রও বিশেষ সংশোধিত হইয়াছে। এই ৫ম সংস্করণের "আনন্দমঠ' ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের "আনন্দমঠ'এ বিশেষ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। দুই একটা নিদর্শন দিতেছি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ভবানন্দ মনে মনে বলিতেছেন—

"যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথী-জলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? **ইহা আমাকে করিতে হইয়াছে; অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।*** আপনার ওজন আপনি না বুঝিয়া মাণদণ্ডে আমি তুলিত হইতে উঠিয়াছিলাম। যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়পরবশ, যে অধর্ম্মী তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাহার আবার সত্য কি? পাপে আমার ভয় কি? অনন্ত নরক আমার কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমার ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে থাকুক, আমি এ দুস্কর্ম্ম করিব। এ দিকেও প্রাণ যায়,

---

* বৃহদক্ষরে আমরাই মুদ্রিত করিলাম।

সেদিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্ত্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্ত্তী তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব। না, ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু"—ইত্যাদি।

৫ম সংস্করণে এই ভবানন্দ এই স্থানে যাহা বলিয়াছে, তাহা ৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, পঞ্চম সংস্করণের আনন্দমঠের নীতি মার্জ্জিত হইয়া অতি উচ্চ সুরে গ্রথিত হইয়াছে।

যেমন ভবানন্দ সম্বন্ধে—তেমই জীবানন্দ সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে।

জীবানন্দও পঞ্চম সংস্করণে যেন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত। শান্তি তাহাকে এই সংস্করণে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে—সে কথা বলা হইয়াছে।

সত্যানন্দ সম্বন্ধেও একটা গুরুতর কথা আছে। যখন চিকিৎসক সত্যানন্দকে দেশোদ্ধারব্রত উদযাপন করিতে বলেন, তখন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে বলিয়াছিলেন—

"বাছা সত্যানন্দ কাতর হইও না। যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ এক্ষণে রাজা না হইলে"—ইত্যাদি।

নূতন সংস্করণে আছে—

"সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না।"

এই পরিবর্ত্তন একপ্রকার গ্রন্থের অস্থিমজ্জার পরিবর্ত্তন। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের সত্যানন্দচরিত্র পাঠ করিয়া সকলেরই

সহানুভূতি সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অবশ্য তাহাতে আকৃষ্ট হইতে গ্রন্থকার অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু এই পঞ্চম সংস্করণে গ্রন্থকার সেই সত্যানন্দচরিত্রের দোষভাগও দেখাইয়া সাবধান্ করিয়া দিলেন। এই যাহা তিনি ৫ম সংস্করণে বলিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণসময়ে ইহা তাঁহার মনে থাকিলে, "আনন্দমঠ" এরূপ ভাবে সৃষ্টই হইতে পারিত না। ফলতঃ পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থের মূলভাগ সংশোধন করিতে গেলেই বড় গোলযোগ ঘটে। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের ৫ম সংস্করণে বোধ হয় এইরূপ দুইচারিটি গোল ঘটিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় ভাগ।

আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম।

দেবী চৌধুরাণী।

চরিত্রবিশ্লেষণ—ব্যাখ্যা—সমালোচনা।

(১) প্রফুল্ল।

এই প্রফুল্ল সম্বন্ধে গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখি,

'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র, কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'

শেষোক্ত এই শ্লোকটি কে কাহাকে বলিয়াছিল, পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। তবু গ্রন্থকারের রীতি অনুসারে আমাদিগকে তাহা একবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামক অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কে না শুনিয়াছেন? এই শ্লোকটী সেই গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময়ে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। এটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক। ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ করিতে পারা যায়—

"সাধুগণকে পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশসাধন জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।"

সেই কথা আজি গ্রন্থকার প্রফুল্লকে বলিতে বলিতেছেন। এ হেন প্রফুল্লচরিত্রে এ অধম লেখকের অতি সন্তর্পণে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

প্রফুল্লজীবনচরিত আমার প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি।

ভবানী পাঠকের সহিত প্রফুল্লের সন্দর্শন পর্য্যন্ত তাহার প্রথম ভাগ। সেই সন্দর্শন হইতে ভবানী পাঠকের দল হইতে ফুল্লের বিদায় গ্রহণ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগ। অবশিষ্ট তৃতীয়

প্রথম ভাগে কবি প্রফুল্লতরুর মৌলিক ক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়াছেন; দ্বিতীয় ভাগে সেই ক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হইল, সেই বীজের প্রকৃতি ও রোপণ-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। শেষভাগে সেই রোপিত বীজের অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফল দেখাইয়াছেন।

ম ভাগ—

এই ক্ষেত্র-বিচারে অনেক কথা বলা যায়। অনেক দিন হইল, বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধায়, এম এ, বি, এল মহাশয় "প্রচারে" এই ক্ষেত্রের মৌলিক প্রকৃতি—নিষ্কামধর্ম্ম-বীজরোপণের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমরা এখন সেরূপ বলিতে চাহি না। আমরা এখন সেই ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলিব। কথাটী প্রফুল্লের পতিভক্তি সম্বন্ধে।

বঙ্কিম বাবুর নভেলের ভালবাসার আদর্শ স্তরে স্তরে কি প্রকারে বিকশিত হইতেছিল, তাহা আমরা অন্যত্র বলি ছি। প্রফুল্লের এই পতি-প্রেমের বিকাশ প্রথমে তত খুলে নাই সত্য —কিন্তু পরে ইহার পূর্ণ অবয়ব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বেশা খুলে নাই, কারণ বেশী খুলিয়া দেখাইবার বিশেষ অবস্থাও ঘটে নাই। প্রফুল্ল স্বামি-সহবাসে বঞ্চিতা। বিরহেই প্রণয় বেশী পুষ্টিলাভ করে। বিরহিণীর প্রণয়ও অনেকস্থানেই বেশী অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যেখানে সেরূপ বাহ্যপ্রদর্শন থাকে না, সেখানে আবার সেই প্রণয় গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে। প্রফুল্লের পতিপ্রেমও এইরূপ। আমরা দুই একটিবার তাহার অভিব্যক্তি দেখিয়াছি মাত্র—কিন্তু সে প্রেম সাধারণতঃ

হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লুক্কায়িত ছিল। সেই অভিব্যক্তি কিরূপ, পাঠকগণকে দেখাইতেছি।

"প্র। থাক্‌ব বলেই ত এসেছি। থাকৃতে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকি, থাকি, যদি—

সা। যদি কি?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল 'বুঝ নাই ভাই?'

অন্যত্র—

"প্রফুল্ল নীচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ন বলিল—'দিদি, কাল রাত্রে কোথা শুইয়াছিলি?'

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে, সে কথা আপনার মুখে বলে না।"

এই দুইদিনের প্রফুল্লকে দেখিলে ও শুনিলেই প্রফুল্লের পতি-প্রেমের গভীরতা বুঝা যায়। এ প্রেমে ভোগের তারল্য ছিল না, বিরহের গভীরতা ছিল।

দ্বিতীয় ভাগ—

প্রফুল্লের জীবনের দ্বিতীয় ভাগে তাহার শিক্ষা-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমে প্রফুল্ল লেখাপড়া শিখিল। লেখাপড়া জ্ঞানশিক্ষার প্রধান উপায়। লেখাপড়া না শিখিলে, মৃত মহাত্মাদের প্রচারিত উপদেশ লোকের মুখে শুনা ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। সেই লোকের মুখে শুনা সকলের পক্ষে সম্ভাব্য নহে—স্ত্রীলোকদের পক্ষে ত নয়ই। তাই প্রফুল্ল প্রথমে লেখাপড়া শিখিল; বাঙ্গলা লেখাপড়া নহে—যে ভাষা জানিলে নভেলপাঠই পড়ার শেষ সীমা দাঁড়ায়, সে ভাষা নহে—যে ভাষায় ভারতবাসীর অনন্ত রত্নরাশি গ্রথিত আছে, সেই সংস্কৃত ভাষা। প্রফুল্ল সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া কিছু দর্শন পড়িল। বুদ্ধিমার্জ্জনার জন্য এমন শাস্ত্র আর নাই। কিন্তু ইহাও প্রফুল্ল বিশেষ করিয়া পড়িল না। প্রফুল্ল বিশেষ করিয়া পড়িল সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

জীবনের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে উপদেশ পাইতে ভগবদ্গীতার মত গ্রন্থ আর একখানিও নাই। প্রফুল্ল সেই গ্রন্থ পড়িয়া জীবনের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে শিখিল।

ভগবদ্গীতার প্রধান শিক্ষা—সুখদুঃখ লাভালাভ জ্ঞান পরিবর্জ্জন করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করা। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের নিকটে সেই শিক্ষা লাভ করিলেন। শুদ্ধ সেই শিক্ষা নহে—সেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান কবিতে অন্য যে সকল শিক্ষা আবশ্যক, প্রফুল্ল সে সব শিক্ষাও পাইলেন।

এই শিক্ষাই বিস্তৃত ভাবে কবি তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লের লেখাপড়া শিক্ষা কিরূপ হইল, তাহা বলিয়াছি। অন্য শিক্ষা কিরূপ হইল, সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রথম বৎসরে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের আহারের ব্যবস্থা

করিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচাকলা। পাঠ অবগত আছেন, হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকেই সাত্ত্বিক আহার বলে—অথ এই আহারেই শরীরের যেমন পুষ্টি হয়, তেমনই সত্ত্বগুণেরং বিকাশ হয়। মাংসাদি শরীরের পুষ্টিকর হইলেও সত্ত্বগুণবিরোধী —তাই হিন্দুর প্রধান আহার এইরূপ। পাঠক এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই আহারটাকে ধর্ম্মের বাহিরে, শিক্ষার বাহিরে রাখাটা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য?

প্রফুল্ল আহার করিত ঐরূপ—আবার কাজকর্ম্মও তাঁহাকে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহাতে তাহার শরীর ও মন উভয়ই পুষ্ট হইতে লাগিল। প্রফুল্ল এই নিয়মমতেই চলিতে লাগিল। কিন্তু একাদশীর দিনে সে এ নিয়ম মানিত না। কবি এই একটা কথায় প্রফুল্লের পতিপ্রেম আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। প্রফুল্ল যে এত ব্যাপারের মধ্যেও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই—কোন পত্নীই বা তাহা পারে?—কবি তাহাই এই এক কথায় বুঝাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে, প্রফুল্লের পক্ষে আহারের ব্যবস্থা হইল—নুন, লঙ্কা, ভাত। আর একাদশীতে মাছ। তাহাতেও প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না। এই আহারে প্রফুল্লের আহারজনিত কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হইতে লাগিল। প্রথম বৎসরের আহারে শরীর ও মন বিশুদ্ধ হইয়াছিল—কাজেই দ্বিতীয় বৎসরে এ আহারে প্রফুল্লের বিশেষ কোন কষ্ট বা ক্ষতি হইল না, প্রত্যুত কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হইতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে প্রফুল্লের আহারের জন্য ব্যবস্থা পূর্ব্বমতই রহিল—কিন্তু তাহাতে একটু বিশেষত্ব এই হইল যে, এবারে তাহার সম্মুখে বসিয়া নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্যাদি নিশিকে খাইবার

ব্যবস্থা হইল। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য লোভসংবরণ শিক্ষা। চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি অতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল।

পাঠকগণ আপনারা তন্ত্রশাস্ত্রের পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচারের কথা কিছু জ্ঞাত আছেন কি? তান্ত্রিক পশ্বাচারীকে বৈদিক সাত্ত্বিকবৎ আচার করিতে হয়। প্রফুল্লের ৩য়বর্ষ পর্য্যন্ত যে আহারের ব্যবস্থা ছিল, তাহা তান্ত্রিক পশ্বাচারের আহারের ব্যবস্থা। পরে এই চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি বীরাচারের আদেশ হইল। অর্থাৎ প্রফুল্লকে প্রথমে পশুর ন্যায় ভয়ে ভয়ে খাদ্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে— প্রফুল্লের আর সে সতর্কতা গ্রহণের আবশ্যকতা রহিল না। তখন বীরভাবে তাহাকে নানাপ্রকার সাত্ত্বিকভাববিরোধী খাদ্যাদির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল খাদ্যাদিগ্রহণজনিত মন্দফলের সহিত প্রফুল্লের পূর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধীকৃত সাত্ত্বিকভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হউক—প্রফুল্ল বীরভাবে সেই মন্দ ফল পরাজয় করুক। পর বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি যদৃচ্ছা ভোজনের উপদেশ হইল; প্রফুল্ল কিন্তু বীরভাবের বিকাশ করিয়া দিব্যভাব গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ পুনরায় প্রথম বৎসরের মত আচার আরম্ভ করিলেন। মহাকবি অজ্ঞাতসারে এইরূপ তন্ত্রের আচার ব্যাখ্যা করিলেন। এমন কোন নূতন কথা বাহির করা বড় সহজ নহে, যাহা এই বিশাল হিন্দুধর্ম্মের কোন শাস্ত্রকার বলিয়া যান নাই।

যেমন আহার সম্ব
এইরূপ ব্যবস্থা হইল

সঞ্চয় হইল; পরে কার্য্যক্ষেত্রে সেই বলের পরীক্ষা হইল; পরীক্ষান্তে পুনরায় সেই বলরক্ষণের চেষ্টা হইল।

যেমন এই সকল আহারবিহারাদির শিক্ষা তেমনই শারীরিক বৃত্তি সকলের অনুশীলনের ব্যবস্থাও হইল। ফলতঃ প্রফুল্ল এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল, যাহাতে তাহার শারীরিক, মানসিক সর্ব্ববিধ বৃত্তিই সামঞ্জস্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। এই শিক্ষাই মহাকবির আদর্শ শিক্ষা। ধর্ম্মতত্বে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ প্রফুল্লই সজীব 'ধর্ম্মতত্ব'। প্রফুল্লের শরীর ও মন উভয়ই সুশিক্ষিত হইল। শারীরিক শিক্ষা না হইলে, ইন্দ্রিয়দমনাদি ও দুঃখাদিসহন গুণ সহজে জন্মে না, তাই প্রফুল্লকে সে শিক্ষাও করিতে হইয়াছিল।

তৃতীয় ভাগ—

প্রফুল্ল-জীবনের দ্বিতীয় ভাগের এই শিক্ষা প্রফুল্ল কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহাই তৃতীয় ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগে সেই শিক্ষা-ফল প্রদর্শনটিতে কিছু কাব্য জমিয়াছে। কথাটা খুলিয়া বলিতেছি।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, প্রফুল্ল বনমধ্যে কিছু অর্থ পাইয়াছিল। ঐ অর্থের ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে, তজ্জন্য প্রফুল্ল একদিন কিছু ব্যতিব্যস্তও হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে

'হার যে কথোপকথন হইয়াছিল,

মেয়ে ভবানী পাঠকের

ন কিছু তাঁহার দেহ

রক্ষার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে সে ধন পৌঁছাইবার উপায়ও প্রফুল্ল জানিত। তাই প্রফুল্ল স্থির করিয়াছিল, সর্ব্বভূতে সে ধন বিতরণ করিবে—তাহা হইলে সর্ব্বভূতাত্মক ভগবানে সে ধন অর্পণ করা হইবে। এ পর্য্যন্ত সকলই অতি পরিষ্কার দেখিলাম। কিন্তু এখান হইতেই গোল আরম্ভ হইল।

যখন এইরূপ স্থির হইল, তখন ভবানী পাঠক বলিলেন।

"কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?"

"প্র। এতদিন কি শিখিলাম?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশবিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হউন।"

প্রফুল্ল যে ভবানী পাঠকের এ কার্য্য সহসা নির্দ্দোষ বা অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচনা করে নাই, কবি তাহাই দেখাইলেন। কিন্তু প্রফুল্লের এ কথা শুনিয়া ভবানীপাঠক তাহার নিকট অনেক বক্তৃতা করিলেন। "ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। কাছারীর কর্ম্মচারীরা বাকীদারের ঘরবাড়ী করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়ি

পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণে বধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবাকে বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভীতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটা-বিন্যাসে বিবৃত করিয়া, ভবানীঠাকুর বলিলেন 'এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলাকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে?' "

এ অত্যাচারের এরূপ কাহিনী শুনিয়া কাহার না দুঃখ হয়? কাহার না হৃদয় গলিয়া যায়? প্রফুল্ল ত তখন জীবের প্রতি দয়া পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ করিয়াছিলেন—একথা এইরূপ ভাবে শুনিয়া তিনি কি আর এই ইহার বৈধাবৈধতার পরীক্ষা করিতে চাহিতে পারেন? তাই প্রফুল্ল তখনই বলিলেন, "আমি সঙ্গে যাইব।" ভবানী বলিলেন, "এই কাজে দোকানদারী চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনী বেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।" পূর্ব্বে এরূপ প্রস্তাবে প্রফুল্ল কি উত্তর করিয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, এখন প্রফুল্ল বলিলেন, "কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কার, আমার নহে। কার্য্যোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ,

তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কার্য্যের জন্য যাহা করিতে হয় করিব।"

মহেন্দ্রের সন্তানধর্ম্মগ্রহণ দেখিয়াছ, এখন প্রফুল্লের এই ভবানী পাঠকের কথিত ধর্ম্মগ্রহণ প্রত্যক্ষ কর। অনেকটা একরূপই নয় কি? সেই সত্যানন্দ ও এই ভবানীর ন্যায় নেতা হইলে, প্রফুল্লের ন্যায় রমণী, মহেন্দ্রের ন্যায় পুরুষকেও তাঁহাদিগের পথে চলিতে হয়।

প্রফুল্ল জীবনের এই ভাগে তাঁহার নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানের একটা বিষম পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইল। উচ্চ শিক্ষা যতই হউক, রমণীত্ব কিছু ধ্বংস হইবার নহে। পতিপ্রেম রমণীর একটা প্রধান রমণীত্ব। প্রফুল্লের সেই রমণীত্ব বা পতিপ্রেম সহিত সেই শিক্ষার কিরূপ সংযোগ হইয়াছিল, তাহাই সেই পরীক্ষার দ্রষ্টব্য বিষয়।

কবি সেই মহাপরীক্ষা দেখাইতে ব্রজেশ্বকে সেই সুশিক্ষিতা নিষ্কামকর্ম্মাবলম্বিনী প্রফুল্লের সমীপে উপস্থিত করিলেন। প্রফুল্ল তখন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে উপদিষ্ট হইতেছেন, অনেক সময়ে নিজে তাহাই করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনেও করিতেছেন। এমন সময়ে, খানিকটা দৈবঘটনায়, খানিকটা প্রফুল্লের ষড়যন্ত্রে (নিরপরাধিনী পতিপ্রাণা সাগরের উপকারার্থ এই ষড়যন্ত্র) ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরাণীর বজরায় উপনীত হইলেন।

"দেবী জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কে?' দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় ফরসা নয়। ব্রজেশ্বর বলিলেন 'পরিচয় লইয়া কি হইবে? আমার ধন সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—না"

হইবে না?' দেবী। 'হইবে বৈ কি? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে।' তবু গলাটা ধরা ধরা। ব্রজ। 'সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?' দেবী বলিলেন, 'নতুবা আপনাকে আমরা আনিতাম না।' দেবী পরদার আড়ালে; কেহ দেখিল না যে, এই কথা বলিবার সময় দেবী চোখ মুছিল। * * * এই সময়ে দেবীর কাছে, আর একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বলিল, 'বলি গলাটা ধরে গেছে যে।'"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড় ছড় করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন, ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক'। সব জানিস্ ত?'"

তার পরে প্রফুল্লের সহিত ব্রজেশ্বরের যেরূপ আলাপ হইল, পাঠকবর্গ স্মরণ করিয়া দেখুন। এই কথোপকথনের শেষে ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল—

"এ দিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোকের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, 'এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?' দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, 'ওসকল ব্রত মেয়েমানু- যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার

মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।' দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'তুমি যমের বাড়ী যাও।' নিশি। 'আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।' দেবী। 'সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।'"

এই কথোপকথন হইতেই উপন্যাসের মূল তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই তত্ত্ব এই যে, সন্ন্যাসে পতিযুক্তার অধিকার নাই। হিন্দুশাস্ত্রেরও এই উপদেশ। কিন্তু আমাদিগের কবি, শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া, ঘটনাচক্রে সেই উপদেশ পালন ও লঙ্ঘনের ফল, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামে দেখাইয়া, সেই তত্ত্ব বা উপদেশ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এখানে দেখাইয়াছেন যে, অমন সুশিক্ষিতা প্রফুল্লও, সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে যাইয়া, অকৃতকার্য্য হইল—এবং তাহার সন্ন্যাসে অধিকার নাই ইহাই স্থির করিল। সীতারাম উপন্যাসেও শ্রী ইহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে—সে কথা যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

এই ঘটনায় দেবীচৌধুরাণীর হৃদয়ে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ঘটনা ত সামান্য নহে—বিপ্লব হইবারই কথা। প্রফুল্লের সেই হৃদয়বিপ্লব নিম্নলিখিত কথোপকথনে সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইবে।

"ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে এক দিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও একাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না তাহা হইলে এ দশবৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এতদিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি? যা এতদিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে? * * * দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায় কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে, আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম?

দেবী। রাজরাণী, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপ খরচ করিতাম, আপনিও সেই রূপ করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

* * *

ভবানী। তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনায় খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়—আমার স্ত্রী-বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর লইতে চাই।

* * *

ভ। ক্ষতি নাই—কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্য-গ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্মে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই, তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এই খানেই আগামী সোম-বার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। * * * ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই কথোপকথন শুনিয়া দেখিলাম—প্রফুল্ল ভবানী পাঠ-কের কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। প্রথমে যখন ভবানী পাঠক এইরূপ কার্য্যের প্রস্তাব করে, তখনও প্রফুল্ল প্রথমে তাহাতে যোগ দিতে অসম্মত হয়। কিন্তু পরে ভবানী পাঠকের কৌশলে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় দরিদ্র ও অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়া, প্রফুল্লের তাহাতে মত হইল। এবং প্রফুল্ল তদনুযায়ী বহুদিন কার্য্যও করিলেন। ডাকাতি অবশ্য করেন নাই—কিন্তু যাহারা ডাকাতি করিত, তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু অদ্য আবার প্রফুল্লের মতি ফিরিল। কেন ফিরিল, গ্রন্থ-কার তাহা এস্থলে নিজে কিছু বলেন নাই—আমরা তাহাই বলি-তেছি।

বহুদিন প্রফুল্ল স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। এই অদর্শন প্রফুল্লের চিত্ত হইতে স্বামিচিন্তা একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে নাই সত্য—সেই একাদশীর দিনে চেষ্টা করিয়া মৎস্য খাইবার কথাটায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—তবু কালের যে একট প্রভাব আছে, তাহাও তাহার চিত্তে কিছু কার্য্য না করিয়াছিল এমন নহে। যদি বিশেষ কোন কার্য্যে ব্রতী না থাকিতে হইত, প্রফুল্ল সে কালের প্রভাবও পরাজয় করিতে পারিতেন—কিন্তু যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রত পালন করিতে তাহাকে স্বামিচিন্তা হইতে অনেক সময়ে বিরত থাকিতে হইত। তাই আমরা অনুমান করি, ধীরে অজ্ঞাত সারে, কতক শিক্ষার কতক কালের, কতক কার্য্য বিশেষের প্রভাবে ব্রজেশ্বর-চিন্তা তাহার মনে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রজেশ্বর যেমন মন হইতে সরিয়া যাইতেছিল—সংসারও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইতেছিল। যেমন সংসার সরিতেছিল, ভবনী পাঠকের উপদিষ্ট কার্য্যে তেমনই মন বাঁধিতেছিল। মন একটা লইয়া ত থাকিবেই। তাই প্রফুল্লের এই কয়েক বৎসরের কার্য্যে আমরা ব্রজেশ্বরের কোন সম্বন্ধ পাই নাই। কিন্তু আজি ব্রজেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত—সেই ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া প্রফুল্লের নিদ্রিত স্মৃতিগুলি আস্তে আস্তে মাথা জাগাইল—সংসারও আসিয়া ব্রজেশ্বরের সঙ্গে মিশিয়া প্রফুল্লের চিত্ত কতক অধিকার করিল। তাই প্রফুল্ল বলিল—"সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।" সে পথের প্রতি সতৃষ্ণ প্রিয় দৃষ্টি পড়িবামাত্র অবলম্বিত পথের প্রতি বিরক্তি-দৃষ্টি পড়িল। তাই প্রফুল্ল আজ ভবানী পাঠকের নিকটে আর সেরূপ কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ব্রজেশ্বর এ কথা

অবশ্য তাহাকে বলে নাই, অন্য কেহও বলে নাই। ব্রজেশ্বরকে দেখিয়াই এতটা ঘটিয়া গেল। একদিন আমরা কলঙ্কিনী পদ্মাবতীকেও পতিদর্শনে এইরূপ মতি পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছিলাম। পাঠক এ তত্ত্বটি বড় সুন্দরই প্রকাশিত হয় নাই কি?

প্রথম পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। পরীক্ষান্তে প্রফুল্ল বুঝিতে পারিলেন যে, ভবানী পাঠকের উপদেশ মত কার্য্য করা তাহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

পরে আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল।

পাঠকগণ একবার সেই বৈশাখী শুক্লাসপ্তমীর কথা মনে করুন। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে সে বড় চিরস্মরণীয় দিন।

সে দিন ব্রজেশ্বরের সহিত প্রফুল্লের পুনর্ব্বার সাক্ষাতের দিন।

"দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—সব ঠিক্ সে রকম নয়। * * *

"* * * দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণ ভূষিতা মহার্ঘ বস্ত্র পরিহিতা নয়; কিন্তু আর এক প্রকারের শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয় সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দন চর্চ্চিত; চন্দন চর্চ্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা সাড়ী।

আজ দেবী স্বামি-সমাগম ভরসায় সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বাহিরের বেশ ত কবি পরিস্কার করিয়াই দেখাইয়াছেন প্রফুল্লের ভিতরের বেশটা এই সময় একবার দেখিতে হয়।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রফুল্ল যে পথে এত দিন চলিতেছিলেন সে পথে আর চলিতে চাহিতেছিলেন না। কেন যে এরূপ পরি- বর্ত্তন ঘটিল, তাহাও বলিয়াছি। প্রফুল্ল যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারি লেন, তিনি যে পথে চলিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার পক্ষে অব লম্বনীয় নহে, অথচ সংসারেও তাঁহার স্থান নাই—তখন হইতে তাঁহার মন কেমন একটা উদাস ভাব অবলম্বন করিয়াছিল যেমন জোয়ার বা ভাঁটা হইবার পূর্ব্বে জলরাশি ধীর, স্থির, উদাস ভাবে পড়িয়া থাকে, তাহার মন তেমনই ভাবে অবস্থান করিতে ছিল। এইরূপ সময়ে সকলেরই একটা বিবেক-বুদ্ধি উপস্থিত হয় —সন্ন্যাসিনী প্রফুল্লের ত তাহা হইবারই সম্ভাবনা। সেই বিবেক উপস্থিত হইলে, প্রফুল্লের স্বতঃ উচ্চ অন্তকরণ আরো উচ্চতর হইয়া উঠিল। মন যখন সেইরূপ উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল, তখন প্রফুল্ল দিবার সহিত নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছিলেন প্রফুল্ল বাল্যাবধিই বিশেষগম্ভীরা—সে গাম্ভীর্য্য এখন চরম সীমায় উপনীত হইল।

দিবা বলিতেছিল—"হাঃ, পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?" "প্রফুল্ল বলিল—'না প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম।"

এই জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন সকল পাঠকেরই বিশেষ স্মরণ আছে এরূপ মনে করি—সুতরাং আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক মনে করিলাম না।

এই কথোপকথন-সময়ে আমরা প্রফুল্লের মুখে শুনিতে পাই-লাম, ইংরাজের সিপাহী তাহাকে ধরিতে আসিতেছিল। সে স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কি রকম? দেখ, এই নদী জল, গাছ পালা, নক্ষত্র সকল আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

'সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব?' বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল। হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?' প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, 'ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে, জান?' "

ইংরাজের সিপাহী প্রফুল্লকে ধরিতে পারিলে, প্রফুল্লের কি হইবে, তাহা প্রফুল্ল জানিত। প্রফুল্ল জানিত যে ইংরাজের বিচারে তাহার শাস্তি ফাঁসি বা ততোধিক কষ্টদায়ক মৃত্যু। ইহা জানিয়াও প্রফুল্ল, স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা, নিশ্চেষ্টা, দিবাকে তত্ত্বকথা বুঝাইতে নিরতা!

পাঠক মনে করিবেন না যে, কেবলমাত্র প্রফুল্লের শিক্ষাতেই তাহাকে আজ এতটা স্থির রাখিয়াছিল—সুশিক্ষা তাহার স্থির থাকিবার অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু মুখ্য কারণ নহে। আজ তাহার এরূপ ভাবের মুখ্য কারণ—তাহার সেইদিনকার ব্রজেশ্বর-সাক্ষাৎ।

মরণের ভয় মানুষের স্বাভাবিক। কিন্তু স্থলবিশেষে এই মৃত্যুভয় হইতে ভীত না হওয়াও মানুষের স্বাভাবিক। আমি সাধারণ মানুষের কথাই বলিতেছি। তুমি আমি অবশ্য মৃত্যুকে ভয় করি—কিন্তু আবার তোমার আমার মনেরও এমন অবস্থা হয় যে,

তখন মৃত্যুভয় আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। প্রফুল্ল রমণী হইলেও, সুশিক্ষিতা রমণী। একে তোমার আমার মত পুরুষের ন্যায় অমন মহামহিমাময়ী জ্ঞানবতীর মৃত্যুভয় না থাকিবারই সম্ভব—তাহাতে আবার প্রফুল্ল সে দিন ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎলাভানন্তর যেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতে তাহার মৃত্যু ভয় থাকিবে কেন? প্রফুল্ল যেন তখন মৃত্যুই চাহিতেছিল—অবশ্য মৃত্যু প্রার্থনা করা তাহার ন্যায় লোকের পক্ষে সম্ভব নহে—তবু যেন তাহার হৃদয়ে এমনই একটা ভাব হইয়াছিল যে মৃত্যু তাহার পক্ষে কিছু প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ে যখন সেই ভাব, তখন প্রফুল্ল দিবার সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। হৃদয়ের যখন সেই ভাব—তখনই নিশির কথার উত্তরে দেবী বলিলেন—

"যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন?"

"তোমার সাধ্য কি দিবা? যা আমি স্থির করিয়াছি তা অবশ্য করিব। আজ স্বামিদর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। * * * একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব। সেই জন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায় দিয়াছি।"

ইহা পড়িয়া আমরা কি বুঝিলাম, কি দেখিলাম? আমরা বুঝিলাম যে প্রফুল্ল পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুজন্য প্রস্তুত—ইচ্ছা করিলে সে মৃত্যুপথ হইতে অনায়াসেই আপনাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিতেন—কিন্তু প্রফুল্ল তাহা করিতে অসম্মত। ইচ্ছা করিলে ইংরেজের সিপাহীকে যুদ্ধ করিয়া হটাইয়া দিতেও বুঝি সমর্থ

ছিলেন, তবু প্রফুল্ল তাহাতে অসম্মত—কারণ প্রফুল্ল একা মরিতে চাহে, তাহার জন্য একটীও প্রাণিহত্যা না হয়, তাহাই তাহার ইচ্ছা।

এইরূপ ইচ্ছার কারণ আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রফুল্লের পক্ষে সেই শুক্লসপ্তমী বড় শুভদিন। সেই দিনের মধ্যে আবার যে ক্ষণে তাহার সহিত ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল, সে বড় শুভ ক্ষণ। আমরা সেই ক্ষণের কথা বলিব। আজ প্রফুল্ল দুরবীণ লইয়া দেখিল, ব্রজেশ্বর আসিতেছেন।

"ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল 'আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব, বোধ হয়। দুই চারি দিন পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।'

গ্রন্থকার লিখিলেন—"ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশবছরের প্রফুল্লের সঙ্গে এই কি কথা!"

"দেবী উত্তর করিল—'আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল দেবী একবার চোক মুছিল—'আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে এই টাকা গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলেই আমি পাইব।'

"ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, 'প্রফুল্ল! তোমার টাকা'—ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমন ব্রজেশ্বর 'প্রফুল্ল' বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে,

অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখের জলের স্রোত ছুটিল।"

ব্যাপার দেখিয়া মনোরমার সেই কথা মনে পড়িল। সেই ভাগীরথিস্রোতে ঐরাবতের কথা মনে পড়িল।

একস্থলে প্রফুল্ল বলিয়াছেন—

"আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা আমি অন্য দেবতার আর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমিই সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।

অন্যত্র—

"ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব, বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝা পড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত?

প্র। তা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?"

তার পরে যখন বিপদ নিকটবর্ত্তী হইল, প্রফুল্ল সকলকেই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন; ব্রজেশ্বরকে তথা হইতে সত্বর যাইতে বলিলেন—কিন্তু ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল না। প্রফুল্ল দেখিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বর যাইতে চাহিতেছেন না, সুতরাং ব্রজেশ্বরের প্রাণরক্ষার্থ তাহার প্রাণরক্ষা আবশ্যক। তাই তিনি, নিজের প্রাণরক্ষার্থও উপায় করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ক্ষণপরে ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে গেলে, তাঁহার শ্বশুরের প্রাণনাশের সম্ভাবনা। কাজেই কথাটা তাঁহাকে ব্রজেশ্বর-সমীপে জানাইতে হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন—'তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।' প্রফুল্ল বলিলেন 'সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমার রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।'

এখানে গ্রন্থকারই আমাদিগের আসনে অবতরণ করিয়া লিখিলেন—"হরবল্লভ তখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না প্রফুল্ল নিষ্কাম

যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।"

ব্যাপার দেখিয়া রঙ্গলাল লোক লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল—প্রফুল্ল বলিলেন।—

"একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্মজ্ঞান নাই। আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?"

রঙ্গলাল চলিয়া গেল। নিশি বলিল,

"ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?"

প্রফুল্ল উত্তর করিল—

'ভাবিয়াছি, ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?'

তারপরে ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপায়, কিরূপে সকল দিকই বজায় রহিল, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। ফলতঃ

এই দিনকার এই ঘটনায় প্রফুল্লের শিক্ষার ফল তাঁহার অতুলনীয় গুণ রাশি প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থকার এই ঘটনায় দেখাইয়াছেন—

(১) প্রফুল্ল বৈকণ্ঠেশ্বরকে সমস্ত সমর্পণ করিতে অত শিক্ষা অমন চেষ্টা করিয়াও, ব্রজেশ্বরকে ভুলিতে পারিল না। (পারিলে কি হিন্দুশাস্ত্রে পতিযুক্তার সন্ন্যাস নিষেধ থাকিত?)

(২) ভবানী পাঠকের নির্দ্দিষ্ট পথে চলা প্রফুল্লের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল—সংসারে প্রবেশ করিতে তাহার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল কিন্তু সে পথ রুদ্ধ দেখিয়া মৃত্যু সম্ভাবনা জানিয়া শুনিয়াও প্রফুল্ল প্রথমে মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল না। কিন্তু শেষ সংসারে প্রবেশের পথ বিঘ্নশূন্য হইলে, পুনরায় আত্মরক্ষার্থ তাঁহার কিছু ইচ্ছা হইল।

(৩) প্রফুল্ল যখন নিজের জীবন রক্ষা আবশ্যক মনে করিল, তখনও তজ্জন্য আপনার অধীনস্থ লোকজনের অকারণ হত্যা অনর্থক ও পাপজনক বলিয়া মনে করিল।

(৪) প্রফুল্ল স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য ও যাহাতে অন্য কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে সম্মত হইল না।

(৫) প্রফুল্ল বুদ্ধিবৃত্তির এমন বিকাশ করিয়াছিল যে, যাহা অন্যের জানিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও সে অনায়াসে বুঝিতে পারিত।

(৬) ভক্তের কাতর প্রার্থনা ভগবান শুনিয়া থাকেন।

এ সকল কথা গ্রন্থেই বড় সুস্পষ্ট আছে, আমরা আর তাহার ব্যাখ্যা করিতে চাহি না।

উপসংহারে প্রফুল্লের পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। প্রফুল্ল সন্ন্যাস

ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন। কেন করিলেন—তাহা তিনি স্বমুখে এইরূপ বুঝাইয়াছেন—

"এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, এই এতগুলি নিরক্ষর স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের, নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন অভ্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।"

শুন শিক্ষিতা অশিক্ষিতা হিন্দুরমণি! শুন, এই প্রফুল্ল কি বলিতেছে—শুনিয়া শিখ যে সংসারধর্ম্ম একটা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মপালনার্থ অতি উচ্চ শিক্ষারই আবশ্যক।

প্রফুল্ল সংসারে কিরূপ কার্য্য করিতেছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাক-

রাণীও রান্না ঘরের কর্ত্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ী আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বউ রাঁধে; কিন্তু যে দিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত, সে দিন কাহারও অন্ন-ব্যঞ্জন ভাল লাগিত না। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধ-পেটা খাইলাম। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে, আর কাহারও সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

"প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্ম্মও তার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে, কর্ত্তা আসিয়া গিন্নাকে বলিতেন, 'নূতন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন?' প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া দিন দিন লক্ষ্মী-শ্রী বাড়িতে লাগিল।"

গ্রন্থকার লিখিলেন—

"এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে

আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ ধর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোণা হইত প্রফুল্ল ভবানী-ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত,—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না, যে তাহার অক্ষর-পরিচয় আছে। গৃহ-ধর্ম্মে বিদ্যা-প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহ ধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।"

এখানে এই প্রফুল্ল-চরিত্র সমাপ্ত করিয়া আমরা আমাদিগের হিন্দুরমণীগণ সম্বন্ধে কয়েকটা অবান্তর কথা বলিতে চাই।

সংস্কৃত ভাষায় পত্নীর একটি প্রতিশব্দ সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই। এই সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ—যে (পতির) সহ ধর্ম্ম আচরণ করে। পত্নীর অনেক প্রতিশব্দ আছে—স্ত্রী, জায়া, ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি। এই প্রতিশব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অর্থবাচক—পতিপত্নীর বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অন্যান্য ভাষাতেও পত্নীর এইরূপ বহুতর প্রতিশব্দ আছে। যথা ইংরাজিতে wife, better-half, ইত্যাদি। এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতে পত্নীর প্রতিশব্দগুলি যেমন একঘেয়ে—একার্থবাচক, সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি সেরূপ নহে। ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি

সবই প্রায় প্রণয়জ্ঞাপক। সংস্কৃতে সেইরূপ প্রণয়জ্ঞাপক প্রতি-শব্দের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উচ্চতর ভাবজ্ঞাপক শব্দও এই ভাষায় আছে। জায়া, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতিশব্দ জগতের অন্য কোন ভাষাতে আছে কি না, জানি না; না থাকিবার কারণ ত যথেষ্ট আছে। তাহা খুলিয়া বলিতেছি। ধর্ম্মাচরণ সকল জাতিতেই করিতেছে, সকল জাতিতেই করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকে এমন সর্ব্ব-কার্য্যব্যাপী বুঝি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিতে করে নাই। প্রাচীন জাতির ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। এখন যে দুইটী প্রবল জাতি সহিত আমাদের সংস্রব রহিয়াছে, তাহাদের কথাই বলিব। দেখ ইংরাজ জাতি। ইহারা কি ধর্ম্মাচরণ করে না? কে বলিবে? স্বার্থত্যাগী পরমযজীবন দীনদয়াল যিশু-খ্রীষ্টের কথা নাই বা বলিলাম, এখনও এমন উদারচেতা পরোপ-কারী প্রবীণ অনেক খ্রীষ্টান আছেন, যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দেখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া, কে বলিতে পারিবে যে, খ্রীষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মাচারী লোক দেখা যায় না? খ্রীষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া কে বলিতে পারিবে যে, প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাচরণ করে না? যেমন খ্রীষ্টান সম্বন্ধে বলিলাম, মুসলমান সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে পারি। এই দুই জাতিই সম্মুখে দেখিতেছি, তাই ইহা-দের কথাই বলিলাম—মনে হয়, অন্যান্য সব জাতিই এইরূপ ধর্ম্মাচারী।

ইহারা সকলেই ধর্ম্মাচারী সত্য, কিন্তু হিন্দুর ন্যায় নহে। খ্রীষ্টানের ও মুসলমানের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—তাহার

সহিত কেবলমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ—অবশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যেমন এই ধর—আহার। খ্রীষ্টানেরা আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ রাখা প্রায় উচিত মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট আহার, শারীরিক অভাব-নিবারণার্থ সুখজনক ক্রিয়াবিশেষ। তাঁহারা আহারে এই দুইটী বিষয়ই খুঁজিয়া থাকেন—শরীরের পুষ্টি ও রসনার আনন্দ। মুসলমানেরাও এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। হিন্দুরা কিন্তু সেরূপ করেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন না। তাঁহাদের জীবনের প্রতি খুঁটিনাটি হইতে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্রের এই আদেশ—এই উপদেশ—এই তাৎপর্য্য। হিন্দুর প্রতি কার্য্যই সেই একাভিমুখী। হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে না, এমন কোন কার্য্যই নাই, থাকিতেও পারে না। অপরাপর জাতি যাহাকে সুখ বলে, হিন্দু তাহাকে সুখ বলে না। হিন্দুব সুখের ধারণা ও সংজ্ঞাও পৃথক্—সেই সুখের ধারণা বা সংজ্ঞা এইরূপ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মানুষ সকল কার্য্যেই সুখ চাহে—সুতরাং হিন্দুর সকল কার্য্যেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, কারণ সেই ধর্ম্মের রেখার কণামাত্র অতিক্রম করিলেও হিন্দুর সুখ হওয়া অসম্ভব। তাই হিন্দুর যেমন আহারে, তেমনই বিহারে সেই ধর্ম্মকার্য্যই প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর বিবাহেও দাম্পত্য-সুখ বা পতিপত্নীর ইন্দ্রিয়-সুখই মূল লক্ষ্য নহে—এবং হিন্দুপত্নীর প্রধান প্রতিশব্দ হিন্দুজাতিমধ্যে প্রণয়িনী নহে—সহধর্ম্মিণী।

এই "সহধর্ম্মিণী" কথাটীই ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের

হিন্দুদিগের পতি-পত্নীর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুজাতির মধ্যেই এই সম্বন্ধটা যেন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে।

হিন্দুর নিকট, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালনের জন্য আশ্রমবিশেষ। এই "আশ্রম" কথাটাতেই সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিস্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই হিন্দুগণ ধর্ম্মোদ্দেশে করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। হিন্দুর আহারও ধর্ম্মবিশেষ। হিন্দুর আহারের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে—আহারকালে যে প্রকার অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতেই উপরোক্ত কথাটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সে সব মন্ত্রের কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর ঘরকন্নাও ধর্ম্মাচরণ। এই ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন আর হিন্দুপত্নীগণ যেন সে কথা মনেই করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু ঘরকন্না যে একটা ধর্ম্ম—যেমন পূজা, সন্ধ্যা, উপাসনা ধর্ম্মাচরণ—যেমন অতিথিসেবা, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণ, ঘরকন্নাও যে ঠিক্ তেমনই একটা ধর্ম্ম—একথা বর্ত্তমান্ কালের হিন্দুপত্নীগণ যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। এই ভয়ানক ভুল হইতেই সমাজে স্ত্রীজাতির এখন অবনতি হইতেছে, আমরা এইরূপ মনে করি। কেন করি, তাহা বলিতেছি।

দেখ হিন্দুপত্নী যাহাকে ধর্ম্মাচরণ মনে করে—তাহা কত সাবধানে, কত যত্নে, কত শঙ্কিতচিত্তে করিয়া থাকে। হিন্দুর পূজার ঘর, পূজার সজ্জা—কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর!

এই পূজা উপাসনার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বুঝিয়াই হিন্দুপত্নী এমন পবিত্রচিত্তে, এমন পবিত্রশরীরে, এমন সযত্নে, এমন সাবধানে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু যেটা 'ঘরকন্না'—তাহাতে হিন্দুপত্নী ত এমন পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কায়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাই ইহাতে এত শৈথিল্য এত অশান্তি, এত কলহ, এত পদস্খলন। তাঁহারা মনে করেন ঘরকন্নাটা না করিলে শরীর চলে না—সংসার চলে না, তাই তাহা অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা "ঘরকন্না"ই ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাহাই সুখের উপায়, তাহাই প্রকৃত সুখ, এরূপ আর মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিয়া শরীর বাঁচাইয়া অন্য উপায়ে সুখলাভ করিতে চাহেন। তাই হিন্দুর গৃহে এখন আর সে পবিত্রতা নাই, সে নিঃস্বার্থপরতার উজ্জ্বল উদাহরণ নাই, সে শান্তি নাই, সে সুখও নাই।

বাস্তবিক এখন আর হিন্দুপত্নীকে প্রকৃত প্রস্তাবে "সহ-ধর্ম্মিণী" বলা যায় না। তাঁহারা এখন প্রণয়িনী মাত্র। তাঁহারা নিজেরাও তাহাই ভাবেন। স্বামীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ছোট বড় সকল কার্য্যে, কোন্ হিন্দুপত্নী দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? স্বামীর কি অনুষ্ঠেয়, কি অনুষ্ঠেয় নহে, স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে কি কর্ত্তব্য, কি নহে—কোন্ পত্নী এখন তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন? তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন একটা বিষয়ের—চাহেনও সেই একটা বিষয়। তাঁহারা পাইতেও চাহেন কেবলমাত্র স্বামীর ভালবাসা, দিতেও চাহেন তাহাই। সে ভালবাসার অর্থ অনেক সময়ে, দুটো মিষ্ট কথা আর দুটো আবদার মাত্র। কিন্তু এই কুহকিনীই তাঁহাদিগের যেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এ "ভাল-

.খন না, দেখিতে পারেন না,
।াসা যে অনেকস্থলেই শতকরা
মোহ কি এমনই একটা কিছু,
না বুঝিয়া এই নিদারুণ হলাহল
.জরা বিকৃত হইতেছেন—পতিদিগকেও
্নে।

, জানি না। পাশ্চাত্য প্রণয়ের আপাত
।ড়া পতির নিকট হইতেই কি "ভালবাসা"
ভাবে হিন্দুগৃহে স্থান পাইয়াছে? জানি না।
এমন হইয়াছে ইহা হিন্দুপতিপত্নীর অস্থিমজ্জায়
নই মিশিয়া পড়িয়াছে যে, বুঝি এই বৃত্তিটার পরি-
খন হিন্দুদম্পতীর একমাত্র এবং অতিমাত্র সুখ বলিয়া
হইতেছে। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত নবেল, নাটকগুলি
বপরিপোষণের সহায়তা করিতেছে। যে নবেল লেখে,
এই ভালবাসার কাহিনী লইয়া লেখে। সেই কাহিনী
আছে, সেই গ্রন্থই ভাল। কুন্দ, আয়েসা যত
। ধরে, শান্তি প্রফুল্ল তত তাহাদের মনে ধরে না।
পতন ঘটিতেছে।

কল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। কাহার
তাকাই? সমাজে যাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া খ্যাতা,
তাঁহারা ত এই ভালবাসার অধিকার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—
তাঁহারা কি আর ইহজন্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন? "ঘর-
কন্না" তাঁহাদিগের নিকট অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত
সম্বন্ধযুক্ত ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীনকার্য্য বলিয়া

তাঁহারা মনে করেব। তাঁহা
রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি
তাঁহারা ব্যস্ত—তাঁহারা কি ঘরক
আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদি
করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত
কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না ক
যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত,
যে "ঘরকন্না" এ কথা তাঁহারা জানেনই না।
আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাহা, তাহা
নির্দ্দিষ্ট স্থানমাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন আর সহধর্ম্মি
আছে প্রণয়িনী মাত্র।

তাই আমাদের বড় ইচ্ছা হয়, এই হিন্দুপত্নীগণকে সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘর একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কা "সহধর্ম্মিণীর" ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তবে আবার আমা এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। এই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দুরমণী আবার ধর্ম্মিণীর" উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রফুল্লের ন্যায় বড় সকল অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া আপনাকে কৃতা বেন? এমন দিন কি হইবে?

অন্যান্য চরিতাবলী।

১। ভবানী পাঠক—

গুরুত্বে প্রফুল্ল-চরিত্রের নীচেই এই চরিত্র স্থান পাইতে পারে। ভবানী পাঠক পণ্ডিত—এত বড় পণ্ডিত যে স্বয়ং প্রফুল্ল দেবী ইঁহাকে বলিয়াছেন—"আপনি মহামহোপাধ্যায়—আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না।"

আর প্রফুল্লের সার্টিফিকেট দিয়াই বা ভবানী-পাঠককে চিনাইতে হইবে কেন? ভবানী পাঠকের কার্য্যেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রকাশিত আছে।

এই ব্রাহ্মণকে আমরা প্রথমে দেখিলাম—গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ—বয়স বড় বেশী নয়। প্রফুল্লের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে বলিলেন, তাঁহার এক দোকান আছে। প্রফুল্ল বলিলেন 'কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখিতেছি।' এ কথায় ভবানী উত্তর করিলেন—

'ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমর সঙ্গে এসো।' ভবানীপাঠক সেই অনেক রকমের ব্রাহ্মণপণ্ডিতমধ্যে এক রকমেব ব্রাহ্মণপণ্ডিতই বটে।

ভবানী পাঠক শুদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নহেন। তিনি একজন অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর। দেখ তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—'এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ হইয়াছে। ইংরেজ

সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য পালন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি। বড় সহজ কর্ম্ম নহে এ—বড় সহজ বীর নহে এই ভবানী পাঠক। যেমন সঙ্কল্প তেমনই চেষ্টা—সিদ্ধি ও তদনুরূপ। কবি লিখিয়াছেন—

"ইংরাজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানীঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

"তখন ভবানীঠাকুর মনে করিল 'আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।' এই ভাবিয়া ভবানীঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।' ভবানীপাঠক প্রফুল্ল চিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।"

যেমন ভক্ত সত্যানন্দের, তেমন এই জ্ঞানী ভবানীপাঠকের চরিত্র। এই চরিত্রে কবির ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করিবার জো নাই। তিনি দেখাইয়াছেন—এ চরিত্র আদর্শশিক্ষা প্রাপ্ত। কিন্তু তবু তাহাতে অতিসূক্ষ্ম দোষের কটাক্ষ করিয়াছেন; কেন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুইপ্রকার মত আমরা সত্যানন্দ চরিত্র সমালোচনাকালে পাঠকবর্গকে বলিয়াছি। আর অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চাহি না।

২। ব্রজেশ্বর—

বর্ত্তমান সময়ের নভেলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একমাত্র স্ত্রীপুরুষঘটিত প্রণয়ই এই নভেলগুলির প্রধান বিষয়। হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তি যথা ভ্রাতৃ-

স্নেহ, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ কোন নভেলে তাদৃশ অঙ্কিত হয় না। আমাদিগের মহাকবির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস গুলিও এ অভিযোগমুক্ত নহে। তবে তাঁহার তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেহ আনিতে পারে না। কারণ এ স্তরের উপন্যাসে তিনি মানুষের সমগ্র কর্ত্তব্যই কাব্যের বিষয় করিয়া দেখাইয়াছেন—তাহাতে এ বৃত্তি, সে বৃত্তি পৃথক্ ভাবে না বলিলেও চলে।

যাহাহউক, ব্রজেশ্বর চরিত্রে সেই স্ত্রীপুরুষের প্রণয়-বৃত্তি ভিন্ন আর একটী বৃত্তির বিকাশ কবি দেখাইয়াছেন। সেটি তাহার পিতৃভক্তি। ব্রজেশ্বর-প্রকৃতই পিতৃভক্ত পুরুষ।

ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ ভাল লোক ছিলেন না। তিনি ভাল লোক থাকিলে, তৎপ্রতি ব্রজেশ্বরের ভক্তিতে আমরা পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত এমন দেখিতে পাইতাম না। যাহাকে অন্য সকলেও ভক্তি করিতে পারে, তাহাকে পুত্র ভক্তি করিলে, সে ভক্তি পিতৃভক্তি বলিয়া পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যা না হইলেও পারে। কিন্তু যে অন্যের ভক্তির পাত্র নহে, তাহাকে পুত্র ভক্তি করিলে, তাহাতেই পিতৃভক্তির বিকাশ ভাল প্রত্যক্ষ হয়। তাই ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি কিছু বেশী ফুটিয়াছে।

পূর্ব্বে অনেক স্থলেই আমরা বলিয়াছি, কোন বৃত্তির পরিমাণ করিতে হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্তি বা তৎবিকাশের বিরোধী অবস্থা দ্বারাই তাহার পরিমাণ হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির বিরোধী বৃত্তি তাহার পত্নীপ্রেম। বড় সহজ নহে এ সংঘর্ষণ।

এ সংঘর্ষণে সচরাচর কি হইয়া থাকে, সকলেই দেখিতেছেন,

কিন্তু পিতৃভক্ত ব্রজেশ্বর তাহাতে কিছু মাত্র টলিল না। সে পিতার কথায় বিনা দোষে অমন প্রফুল্লকে পরিত্যাগ করিল— পিতার অসন্তুষ্টি-ভয়ে মৃত্যু স্বীকার করিয়াও প্রফুল্লকে আনিবার কথা প্রকাশ করিল না। পিতার জন্য প্রফুল্লকে বলিল— "তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।" পিতা যতই অসৎকার্য্য করিতেন, ততই যেন ব্রজেশ্বর জোর করিয়া অভ্যাস করিতে লাগিলেন—

"পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীযন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"

এ পিতৃভক্তি আধুনিক যুবকগণের দেখিবার বিষয় বটে।

৩। সাগর—

কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়া এই সাগরের সৌন্দর্য্য সবিশেষ প্রদর্শন না করিলে কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি হয়। অ... আমরা মহা কবির এই শেষের স্তরের উপন্যাস-সমালোচনা, এইরূপ চরিত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ প্রস্তুত নহি। প্রস্তুত নহি, কারণ ইহাতে আমাদিগের আর সে রুচি সুতরাং সে ক্ষমতা নাই। যে সময়ে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি, দলনী প্রভৃতি চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলাম; বুঝি তখন এইরূপ চরিত্র পাইলে বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু এখন আর তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। এই যে আমাদিগের অসামার্থ্য, ইহাতেও কবির ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা সমালোচক হইয়া, শান্তি, শ্রী, প্রফুল্ল, সীতারাম, সত্যানন্দ প্রভৃতি চরিত্র

সঙ্গে এই সাগরের চরিত্র বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে আমাদিগকে অক্ষম মনে করিলাম, কবি কিন্তু এক আসনে বসিয়া এক তুলিতে এই বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন!

সাগরের অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার দুই একটা ঊর্ম্মির খেলা না দেখাইলে যুবা পাঠকবৃন্দের নিকট লজ্জিত হইতে হয়। তাই সাগরের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতেছি।

সাগর ভ্রমর জাতীয়া রমণী। ঠিক তেমনই ছোট, তেমনই প্রেমিকা—তেমনই বুদ্ধিমতী, তেমনই রসিকা। ভ্রমর-চরিত্রের যেটুকু কলঙ্ক—যে দুর্জ্জয় অভিমান, তাহাও সাগরের চরিত্রে যে না দেখিতে পাই এমন নহে। সেই যে দিন সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িয়া তাহার ক্রোধ নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, যে দিন ব্রজেশ্বর রাগে পা টানিয়া লইতে, সেই পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিয়াছিল—সেই দিন সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণির ন্যায় বলিল—

"কি আমায় নাথি মারিলে?"

"ব্রজেশ্বর। যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড় মানুষের মেয়ে,কিন্তু পা আমার—তোমার বড় মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর বলিল—"ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

এ ডেমাক বড় কাব্যময়। ইহার বিশ্লেষণ বড় সহজ ব্যাপার নহে।

তা' সাগর অভিমানী থাকুক, আর যাহাই থাকুক, তাহাকে

সহজে ভুলা যায় না। বড়ই মনোহর, বড়ই নয়নরঞ্জন এই চিত্র। সাগরের পতিপ্রেমের কথা নাই বা বলিলাম—সাগরের আর যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই তাহাকে ভুলিতে পারা যায় না। সাগরের সেই সর্ব্বব্যাপী স্নেহ—সেই প্রফুল্ল-প্রতি প্রকৃত ভগিনীবৎ ভালবাসা সংসারে বড় দুর্লভ জিনিস। এ স্নেহের পরিচয় আমাদিগের মহাকবির গ্রন্থেও বুঝি এমন আর নাই। ফলতঃ এই সাগরের এক তীরে সেই কাপালিক-প্রতি-পালিতা কপালকুণ্ডলা—অন্যতীরে সেই পতিস্নেহপালিতা ভ্রমরকে দেখিতে পাই। যাহার দুই তীরে এমন দুইটি প্রসিদ্ধ চিত্র-তাহার কি বর্ণনা লিখিব!

৪। নিশা—

নিশা আজীবন কুমারী বা পতিসম্বন্ধরহিতা সন্ন্যাসিনীর চিত্র। পতিযুক্তা, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণে উদ্যতা প্রফুল্লের পার্শ্বে ইহার সমাবেশ বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সীতারামে যেমন শ্রী ও জয়ন্তী, তেমন এই গ্রন্থে এই নিশা ও প্রফুল্ল।

নিশা জয়ন্তীতে বিশেষ প্রভেদ নাই; প্রভেদ যা, তাহা এই এই শ্রীতে ও জয়ন্তীতে। নিশার সেই কথা—"ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যাইতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই"—এই নিশার চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ এই নিশা ও জয়ন্তী সন্ন্যাসিনীর আদর্শ চিত্র।

অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা।

ভাষা—

উপন্যাসে নানাবিধ কার্য্যে নানাপ্রকার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। চরিত্রের কথোপকথনে একরূপ—গ্রন্থকারের উপাখ্যান-বর্ণনে অন্যরূপ। মন্তব্য লিখনে একরূপ—উচ্ছ্বাস-বর্ণনে অন্যরূপ। বলা বাহুল্য যে,আমাদিগের মহাকবির এসকল ভাষাতেই বিশেষ অধিকাব ছিল। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে কথোপকথনই বেশী—এবং এই কথোপকথনের ভাষা পাঠ করিলে কবির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

এই কথোপকথনগুলি অত্যন্ত সরস, অতি সংক্ষিপ্ত, অথচ বহুভাবযুক্ত। লেখকের লেখনী যেন নির্ভয়ে যদৃচ্ছা লিখিয়া গিয়াছে—এবং তাহাতেই যেন এমন সুন্দর, এমন মার্জ্জিত লিপি-কৌশল ফুটিয়াছে। দেবীচৌধুরাণীর আরম্ভ হইতেই দেখ। এখন অনেক উপন্যাসে এই রকমই আরম্ভ দেখিতে পাই—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা কোন উপন্যাসে এমন আরম্ভ দেখিয়াছ কি? দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষা যেন সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যাহার কথোপকথনই পাঠ করা যায়—কি প্রফুল্ল ও তাহার মাতার, কি হরবল্লভ ও তাহার পত্নীর, কি সাগর ও নয়ানের, কি ব্রজেশ্বর ও ব্রহ্মঠাকুরাণীর, কি নিশি ও প্রফুল্লের, কি সাগব ও ব্রজেশ্বরের—সর্ব্বত্রই মহাকবির নির্ভয় ও মার্জ্জিত লিপিকার্য্য দেখিয়া নিতান্তই বিস্মিত হইতে হয়। আবার এই ভাষা যেন সর্ব্বত্র হাস্যমাখা। ভাষার ভিতর হইতে যেন মহাকবির প্রতিভার জ্যোতি বিকিরণ হই-তেছে। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে পাঠকবর্গকে কোন অংশ উদ্ধৃত

করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। তা নাই বা দেখাইলাম, আমাদিগের কথাগুলি শুনিয়া পাঠকবর্গ পুস্তক খুলিয়া দেখুন, আমাদিগের বর্ণিত গুণ অপেক্ষা সে ভাষায় শত সহস্র অধিকতর গুণ দেখিতে পাইবেন।

বর্ণনা—

দেবীচৌধুরাণীতে বোধ হয় একটী মাত্র প্রকৃতি-বর্ণনা আছে। তাহা এই—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে, কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর,—স্রোতে, আবর্ত্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বহিয়া, তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর তর কল কল পত পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ, একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

"সেই ত্রিস্রোতার উপরে কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানাবর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মূরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল দাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিলটি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—এক জন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য।

"ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি চারি আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া এক জন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে—ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই, স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া

টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসরের আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে এক খানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণা দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলে শ্বেত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি, অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ, পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি চূর্ণ গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সম্বেষ্টন করিতেছে।

"ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা-বাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয়

জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণের ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই বীণের শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে,—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল। নাদ কুসুমের মালার মত নদী কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই একটি পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নট রাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।”

এই বর্ণনাটিকে আমি একটি অত্যুৎকৃষ্ট খণ্ডকবিতা বলিয়া মনে করি। এইরূপ বর্ণনায় কবিকে অনায়াসে ধরা যায়। বঙ্গের সহস্র সহস্র কৃতী পুরুষের বর্ণনাগুলি বাছিয়া বাছিয়া একস্থানে কর, তাহার মধ্যে এই বর্ণনাটি ফেলিয়া দেও, অনায়াসে মহা-

কবির এই বর্ণনা চিনিয়া বাহির করা যাইবে। ভাষাতেও কবিকে ধরা যায়—কিন্তু আজ কাল ইহার এমন রমণীয় অনুকরণ দুই এক স্থানে দেখা যায় যে, একথা বলিতে তেমন সাহস হয় না। তবে এরূপ বর্ণনা দেখিয়া কবিকে ধরিতে কোন রকমই সঙ্কোচ হয় না।

এই বর্ণনার যে কত গুণ, শতমুখেও তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্ণনার শরীর ভাষা—সে ভাষার কথা ত পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাণ—দৃষ্টি, অলঙ্কার—উপমা। এই বর্ণনায় দুই তিন প্রকারে কবির দৃষ্টি পড়িয়াছে; এক, সেই নির্জ্জীব প্রকৃতির শোভায়। দুই, সেই নির্জ্জীব প্রকৃতির শোভার সহিত, সেই সজীব প্রকৃতি প্রফুল্লের শোভা সাদৃশ্যে। এই দুইটি বড় পরিস্কার—পরিস্কার তবু সুন্দর। একটু প্রচ্ছন্ন থাকিলে যেন আরও কত সুন্দর হইত। কিন্তু কবি তাহা করেন নাই। আমাদিগের উদ্ধৃত অংশের বৃহত্তর অক্ষরে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহাতেই দেখিতে পাইবেন, সে সাদৃশ্য কবি খুলিয়াই দেখাইয়াছেন। এ সাদৃশ্য তিনি এইরূপে যে খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার কারণ আছে। তিনি ইহা খুলিয়া দেখাইয়া আর একটী সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। সেইটি, বর্ণনার প্রতি তাঁহার তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টি। প্রফুল্লের বহিঃসৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বাহিরের শোভার সহিত—প্রফুল্লের মনের শোভার—তাহার মনের ভাবের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধই রহিয়াছে! সেই কথাটি একস্থলে গ্রন্থকার একটু মাত্র ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন, কিন্তু পরিস্কার বলেন নাই; আমরা তাহা একটু পরিস্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রফুল্লের সেই দিনকার অবস্থা কিরূপ ছিল; পাঠকগণ একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। আজ দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রফুল্ল স্বামীকে দেখিতে পায় নাই—এই দশ বৎসর পূর্ব্বেও স্বামীকে প্রফুল্ল বেশী দিন দেখে নাই। এ জীবনে স্বামীর সহিত আলাপ সেই এক দিন—সেই এক দিনের পরেও আজ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিবিরহ স্ত্রীর নিকট একদিনে এক বৎসর—সেই হিসাবে প্রফুল্লের এই স্বামিবিরহ আজি কত যুগযুগান্তরের ভাবিয়া দেখুন। প্রফুল্লের সেই স্মৃতি, সেই স্বামিস্মৃতি, সেই স্বামীর সহিত মিলনের স্মৃতি, ঠিক ঐ জ্যোৎস্নার ন্যায় নয় কি? ঠিক তেমনই মধুর, তেমনই মৃদু উজ্জ্বল, তেমনই অন্ধকারমাখা নয় কি? ঠিক তেমনই স্বপ্নময় নয় কি? বিস্মৃতির আঁধারে মিশিয়া সেই সুপস্মৃতি, অদ্যকার এই চন্দ্রকিরণ যেমন পৃথিবীর উপর পতিত হইয়াছে, তেমনই তাহার হৃদয়োপরি স্বপ্নময় আবরণের মত পড়িয়াছিল নয় কি?

তার পরে, আজ আবার সেই বহুদিন পরে স্বামি-সন্দর্শন হইবে। এত দিন বিরহ নিদাঘে সেই স্বামি মিলনাশা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল—আজ আবার সেই আশা ঐ বর্ষাকালের ত্রিস্রোতার ন্যায় হৃদয় প্লাবিত করিতেছে। যেমন আঁধারে আঁধারে সেই ত্রিস্রোতাধারা—সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিতেছিল—তেমনই নীরবে প্রফুল্লের স্বামিমিলন-আশা কল্পনার বেগে সেই স্বামীর অভিমুখে ছুটিতেছিল। যেমন ত্রিস্রোতার কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের গর্জ্জন, সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছিল—চাহিয়া দেখিলে প্রফুল্লের

সেই আশাস্রোতের সেইরূপ কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের ও প্রতিহত স্রোতের গম্ভীর গর্জ্জন, সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর হৃদয়ব্যাপী শব্দ উঠিতেছিল। সেই মিলনে বাধা অনেক—সেই বিঘ্নের কথা যখন মনে উঠিত, প্রফুল্লের হৃদয়ে ঠিক ঐরূপই গর্জ্জন হইত—সেই আশা যখন উচ্ছ্বসিত হইত, তখনও প্রফুল্লের হৃদয়ে ঠিক ঐরূপই গর্জ্জন হইত। ফলতঃ ঠিক ঐ ত্রিস্রোতার ধারার ন্যায় প্রফুল্লের স্বামি-মিলনাশা অমনিই করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তার পরে যেমন চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছিল; কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেখানে একটু চিকিমিকি কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছিল, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। প্রফুল্লের সেই স্বামি-মিলনাশা-স্রোতাপরি সেই স্বামি-মিলন-সুখ-স্মৃতি তেমনি গণ্ডিত হইয়া, তেমনই কখনও চিকিমিকি কখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল। সেই তেমনই করিয়া মিলন-পথে বিঘ্নচিন্তায় যখন আশা-স্রোত প্রহিহত হইতেছিল, সেখানে সেই সুখ যেন উজ্জলতর হইয়া তেমনই ঝিকিমিকি করিতে ছিল।

এই বর্ণনার প্রতিছত্রে এইরূপ অদ্ভুত কবিত্ব আছে—কিন্তু সকল খুলিয়া দেখাইতে পারি, আমাদিগের সে সাধ্য নাই—সে স্থানও নাই।

ঘটনা—

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের একটি ঘটনা বড়ই সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকৃতি-সাহায্যে দেবীর বিপদ

হইতে উদ্ধার লাভ ঘটনাটি বড়ই কৌশলময়। এই অদ্ভুত, প্রায় দৈবব্যাপার-তুল্য, অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা বড়ই প্রীতিপ্রদ ও অভীষ্ট ফলদায়ক।

ইতিবৃত্ত।

১২৯১ সনের ২৩ বৈশাখ, 'দেবীচৌধুরাণী' পৃথক উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে, ইহার কিয়দংশ "বঙ্গদর্শন"-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি ইহার ৭টি সংস্করণ হইয়াছে।

দেবী. চৌধুরাণী লিখিবার সময়ে গ্রন্থকার কলিকাত বৌবাজারে থাকিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় ভাগ।

আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম।

সীতারাম।

চরিত্রবিশ্লেষণ—ব্যাখ্যা—সমালোচনা।

(১) সীতারাম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কয়েকটি সুন্দর তত্ত্বের বিবৃত্তি জন্য 'সীতারাম' উপন্যাস প্রণীত হইয়াছে। গীতার যে শ্লোকগুলিতে সেই তত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট, তাহা গ্রন্থকার পৃথকভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্লোকগুলি দুই ভাগে বিভক্ত।

একভাগের শ্লোকগুলি এইরূপ:—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গোস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"

গীতা, ২অ, ৬২-৬৪ শ্লোক।

ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়ঃ—

(কোন) বিষয় সম্বন্ধে ধ্যান (প্রগাঢ় চিন্তা) হইতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে অভিলাষ বা তৃষ্ণা এবং অভিলাষ বা তৃষ্ণা হইতে (তাহা প্রতিহত হইলে—পূর্ণ না হইলে) ক্রোধ সঞ্জাত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে (ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির) স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি এইঃ—

"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥"

গীতা, ৩অ, ১—৯ শ্লোক।

বাঙ্গালায় এইরূপ অনুবাদ করা যায়ঃ—

অর্জ্জুন কহিলেন,—"হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার অভিমত হয়, তবে কেন আমাকে নিদারুণ (যুদ্ধ) কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? (কখন কর্ম্মের প্রশংসা, কখন জ্ঞানের প্রশংসা) এইরূপ বিমিশ্র সন্দেহ-উৎপাদক বাক্যের ন্যায় বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছে। যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করি, এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল।"

শ্রীভগবান কহিলেন,—"হে অনঘ, এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা বা মোক্ষোপায় আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি—সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগনিষ্ঠা ও যোগীদিগের কর্ম্মযোগনিষ্ঠা। কর্ম্ম না করি-

(জ্ঞানের) অবস্থা লাভ করিতে পারে না।
স্থানে) কেবলমাত্র কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ গুণসকল সকলকেই বাধ্য করিয়া কর্ম্ম করায়। যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভাবনা করেন, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়। হে অর্জ্জুন, যিনি কিন্তু মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, সেই ফলাভিলাষশূন্য কর্ম্মকারীই সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। তুমি অনুষ্ঠেয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল; কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্দারাই আবদ্ধ; অতএব তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে (তাঁহার প্রীতিজনক) কর্ম্মানুষ্ঠান কর।"

এই দুই শ্রেণীর শ্লোক-মধ্যে—প্রথমোক্ত শ্লোকগুলি সীতারামচরিত্রে মুখ্যভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; শেষোক্ত শ্লোকগুলি শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্রে মুখ্যভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রোপরি ইহার কার্য্য তত সুস্পষ্ট নহে। ফলতঃ এই তিনটি চরিত্র লইয়াই "সীতারাম" উপন্যাস—ইহাই সীতারাম-সঙ্গীতের মূল সুর—নন্দা ও রমা মূর্চ্ছনাদি মাত্র। যেমন "দেবী-চৌধুরাণীতে" প্রফুল্ল—নিশাই মূল চরিত্র—সাগর প্রভৃতি সাজ মাত্র, "সীতারামেও" শ্রী, জয়ন্তী, সীতারাম ভিন্ন অন্যান্য চরিত্র সেইরূপ সাজমাত্র। ফলতঃ "সীতারাম" দেবীচৌধুরাণীরই অপর পৃষ্ঠ; শ্রী প্রফুল্লেরই অপর পৃষ্ঠা। নিশা ও জয়ন্তীতে

প্রভেদ মাত্র নাই। তবে জয়ন্তী স্বরূপ।
আবার এই দুইখানি গ্রন্থই 'আনন্দমঠের' অপরাংশ বলিলে হয়। জীবানন্দ সেখানে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ-বধূ শান্তি তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব দেখাইতেছেন—এখানে ব্রজেশ্বর সংসারী, সন্ন্যাসিনী প্রফুল্ল তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব দেখাইতেছেন—দুইয়েরই অপূর্ব্ব ফল দেখিলাম। আবার এখানে সীতারাম রাজা—সন্ন্যাসিনী শ্রী তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব দেখাইতে পারিলেন না, তাহারও অদ্ভুত ফল প্রত্যক্ষ করিলাম। সীতারামের শ্রী যদি ফুল্ল হইত, রমা যদি শান্তি হইত, তবে কি ফল হইত—দেবী-চৌধুরাণীতে ও আনন্দমঠে পড়িলাম; জীবানন্দের শান্তি যদি রমা বা শ্রী হইত—তবে কি হইত, সীতারামে পড়িলাম। এইরূপ কত আর দেখাইব—গ্রন্থ তিনখানি যেন এক মহা-গ্রন্থের তিনটি অংশ মাত্র।

আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব—"সীতারাম" উপন্যাস লইয়া; আমরা এখন তাহাই আরম্ভ করিব। প্রথমে সীতারামের কথা বলিব, পরে অন্যান্য চরিত্রের কথা বলিব।

এমন লোক কেহ এ জগতে আছেন কি, যিনি জন্মাবধি কোন দিনও ভাবেন নাই যে, কেন এ জগৎ—কেন এ মানব-জন্ম? কি করিতে আসিয়াছি—কি করিব? এই যে দিন-রাত্রি অর্থোপার্জ্জন চেষ্টায় বিব্রত হইয়া ভোগসুখকেই জীবনের সার কার্য্য স্থির করিয়াছি, ইহাই কি কর্ত্তব্য—না, আর কিছু আমাদের কর্ত্তব্য আছে? এই যে ভোগাদির বাসনা নিয়ত হৃদয়মধ্যে দাবানল জ্বালিতেছে, ইহার সেবাই ধর্ম্ম—না ইহার দমন আবশ্যক? ঐ যে বাবুটি অনুদিন অর্থোপার্জ্জন করিয়া

ভোগাং   ্ত চেষ্টা করিয়া তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, উনিই ভাল করিতেছেন—না, ঐ যে সন্ন্যাসীঠাকুর ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভস্ম মাখিয়া ঐ গাছতলায় পড়িয়া আছেন, উনিই ভাল করিতেছেন? গৃহী হওয়া ভাল—না, সন্ন্যাসী হওয়া ভাল? কর্ম্মত্যাগ ভাল—না, উন্নতি-বিধায়ক কর্ম্ম ভাল? কেহ এমন এ জগতে আছেন কি, যিনি পর্য্যায়-ক্রমে একবার সংসার ও একবার সন্ন্যাসের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন না? একবার ভাবেন নাই যে, সন্ন্যাস ভগবানের অভিপ্রেত নহে—তাহা হইলে এই কামপ্রবৃত্তি, এই স্নেহসুখ, এই ইন্দ্রিয়সুখ সৃষ্ট হইল কেন? যদি ইহার উচ্ছেদই ভাল হইত, তবে ইহার উৎপত্তি হইল কেন? আর সন্ন্যাসই যদি ভাল হয়, তবে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে? কাম-প্রবৃত্তির উচ্ছেদে যে মনুষ্যের উৎপত্তি নিবারিত হইবে; রাজা বা শাসনকর্ত্তার অভাবে যে সন্ন্যাস অপালনীয় হইবে; তখন কে কাহাকে রক্ষা করিবে? আবার অন্যবার ভাবেন নাই যে, ধিক্ এ সংসারে—যেখানে সুখের উপরে মানুষের কর্তৃত্ব নাই, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিপরিপূর্ণ এই সংসারের সুখ যে কেবল দুঃখেরই আবরণ মাত্র। একটু ঘর্ষণেই প্রকৃত দুঃখই যে বাহির হইয়া পড়ে! ঐ যে কামলালসা, কৈ ইহাতে ত প্রকৃত সুখ পাইলাম না! উহাতে অতৃপ্তিই আনয়ন করে, তৃপ্তি ত আনিতে দেখা যায় না! আর উহার ভোগই বা সম্যকরূপে হইতে পারে কৈ? আমি কুৎসিৎ, আমি অর্থহীন, কোন সুন্দরী রমণী ত আমার ভোগ্যা হইবে না! আর অর্থ—তাহাই বা কি অদ্ভুত ব্যাপার—আমি দিনরাত্রি গায়ের রক্ত জল করিয়াও দুইটি পয়সা উপার্জ্জন

করিতে পারিতেছি না, আর একজন কি না, বিনা-পরিশ্রমে জন্ম হইতেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি! ধনার্জ্জন সকলে করিতে পারে না—যশোলাভও সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কিন্তু ঐ যে সন্ন্যাসীঠাকুর বেশ শান্তচিত্তে বৃক্ষমূলে বসিয়া আনন্দলাভ করিতেছে, উহা ত বুঝি সকলেই হইতে পারে! ভগবানের বুঝি উহাই অভিপ্রেত। উহাতে আর কোন বৈষম্য নাই—ধনের নাই, যশের নাই, রূপের নাই, গুণের নাই—সব সন্ন্যাসী এক! আর সন্ন্যাসী হইলে যে সংসারীর সকল সুখই পাওয়া যায়! এমন কঠোর মৃত্যুকষ্ট, তাহাও কমিয়া যায়, এমন যে দুঃখদায়িনী মায়া, তাহারও ত হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়! একবার ভাবেন নাই যে, সংসারধর্ম্ম ধর্ম্মানুমোদিত হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠতর—যাহাদিগকে রিপু ভাবি, তাহারা সুসংযত হইলে, সৃষ্টিরক্ষা করিয়া সংসারীকে সুখী করে। সন্ন্যাস প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য—সংসারই ভগবানের অভিপ্রেত। ধর্ম্মপথে থাকিলে, সংসারে কখনও ক্লেশ হইতে পারে না—সন্ন্যাসে ক্লেশই সার। আবার পরক্ষণই ভাবেন নাই যে, সংসারে ধর্ম্মপথে চলা যে প্রভূত শিক্ষাবল না থাকিলে হয় না, আর সে শিক্ষা যে ঘরে বসিয়া হইবার নহে, তাহাও ঐ সন্ন্যাসীর কাছে শিখিতে হইবে। যেমন সংসার ভিন্ন সন্ন্যাস হয় না, তেমন যে সন্ন্যাস ভিন্নও সংসার হয় না। আগে পাছে সন্ন্যাস—মধ্যে সংসার। আগে পাছে শিশুকাল ও প্রাচীনকাল—মধ্যে যৌবনকাল। সংসারীর প্রথম শিক্ষা—সন্ন্যাসে; আবার সংসারের পরিণতি বা চরমোন্নতি—সন্ন্যাসে। কামাদির উচ্ছেদ দ্বারা তৃপ্তিলাভের চেষ্টায় যে কষ্ট, শিক্ষা

দ্বারা উহা সংযতরূপে ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টায় যে তদপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্ট। বড়ই বিষম এই সমস্যা—সংসার না সন্ন্যাস—কার্য্যানুষ্ঠান না কর্ম্মত্যাগ—আসক্তি না বিরতি! কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসত্রয়ে জীবনের এই সমস্যার সমালোচনা করিয়াছেন।

গীতায় গৌণভাবে আর অনেক তত্ত্ব থাকুক—কিন্তু মুখ্যভাবে ইহাই তাহাতে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ ছলে এই সমস্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই সমস্যাই গীতার মজ্জা। বোধ হয় এই সমস্যা তখন লোকদিগকে অত্যন্ত আন্দোলিত করিতেছিল—লোকে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর কথা কহিত। সময় বুঝিয়া ভগবান এই সমস্যা ব্যাখ্যা করিলেন—নূতন কিছু বলিলেন না—পূর্ব্বোক্ত লুপ্ত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।* আর আজি যদি বলিতে দেও, তাঁহার দাসানুদাস ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সময় বুঝিয়াই তাহা বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সংসার না সন্ন্যাস—কর্ম্ম না জ্ঞান—ইহার কোনটি শ্রেয়—তাহা ভগবান অর্জ্জুনকে তৃতীয় অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন; এবং সেই উপদেশই "সীতারাম" উপন্যাসের মস্তকে শোভা পাইতেছে। ভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছি; এখন তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে চাহি। ভগ-

* "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।"

বান বলিলেন—মূলতঃ ইহার কোনটীই পূর্ণ নহে—সংসার-সন্ন্যাসই পূর্ণ ধর্ম্ম। সংসারী না হইয়া, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া, জ্ঞান উপার্জ্জন না করিয়া, কর্ম্মত্যাগে মোক্ষ হইতে পারে না; আবার সন্ন্যাসী না হইয়া, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিয়া, কর্ম্ম করিলে, তাহাকে সংসার-ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে না। যিনি সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী, বা যিনি সন্ন্যাসী হইয়া সংসারী, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন। জনকাদি রাজর্ষিগণই প্রকৃত ধর্ম্মবেত্তা। ফল-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করাই প্রকৃষ্ট কর্ম্ম।

এখন এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি? সকলের পক্ষে কিছু তাহা সমান হইতে পারে না; লোকের অবস্থা-ভেদে, পরিবার-ভেদে, দেশভেদে, কাল-ভেদে ইহার বিভিন্নতা হইবে। অর্জ্জুনের দেশকাল-অবস্থানুসারে তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে সেই কর্ম্ম করিতে ভগবান আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যদি অস্ত্র লইয়া তোমার পিতামহকে বিনাশ করিতে যাও, তবে তাহাতে কি ভগবানের অনুমোদিত কার্য্য হইবে? তাহা নহে।

এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বুঝিতে ভয়ানক ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। তোমার আমার ত জন্মিতেই পারে; অমন যে শ্রী, জয়ন্তী, সীতারাম—তাঁহাদেরও ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। এই ভ্রান্তি-রহস্য সীতারাম উপন্যাসে বিবৃত দেখিতে পাইবে—সেই কথা এখন বলিতেছি।

সীতারাম-চরিত্র বুঝিতে হইলে, তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে; তাহা তিনি কিরূপ স, . করিয়াছেন,

কোন্ কোন্ বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সেই কার্য্যের কিরূপ মুখ্য ও কিরূপ গৌণ ফল দাঁড়াইয়াছে, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা সীতারাম বুঝিবে না। সীতারাম উপন্যাস চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ নহে যে, চোঁ করিয়া পান করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মিবে। ইহাকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় কষ্ট করিয়া ছাড়াইয়া লইতে হইবে, তবে ইহার রস বুঝিতে পারিবে। ইহাতে একটু দাঁত থাকিলে ভাল হয়, পরে ছাড়াইয়া দিলেও ইহাতে দন্তের আবশ্যক।

সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রথম পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধমাত্র নাই। উহাতে কেবলমাত্র তখনকার ফকিরের প্রতাপ, মুসলমানের ক্ষমতা ও হিন্দুর প্রতি যবনের অত্যাচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু লিখিত না থাকিলেও, উহাতেই সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সূচিত হইয়াছে। তুমি ঐ স্থানে বসিয়া আছ, তোমার সম্মুখে তোমার একজন পরিচারক দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, দস্যু তাহাকে বধ করিতে যাইতেছে—এস্থলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? তাই, সীতারামের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দেখিলাম—মুসলমানের অন্যায্য অত্যাচারের হস্ত হইতে হিন্দুর মুক্তি-সাধন। তবে কি সেই সময়ে সবলেরই তুল্যভাবে সেই একই মাত্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ছিল? তাহা নহে যাহার যেমন শক্তি, যেমন অবস্থা, তদনুসারেই ত তাহার অনু. · কর্ম্ম স্থির হইবে! সীতারাম পরাক্রান্ত,

রাজসদৃশ লোক, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, চেষ্টা করিলে হিন্দুকে কতক পরিমাণে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—সেই অত্যাচার হইতে হিন্দুর রক্ষা-সাধনের চেষ্টা করা। প্রথমে কিছু অত বিস্তৃত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হয় নাই—প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইল—গঙ্গারামকে রক্ষা করা। প্রথম পরিচ্ছেদে ইহাই দেখিতে পাইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতারামের আর একটী ক্ষুদ্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দেখিলাম। সীতারামের আরম্ভ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিলাম—সীতারামের এক পরিণীতা ভার্য্যা পরিত্যক্তা হইয়া আছে। তাহার নাম—শ্রী। শ্রীকে সীতারাম ধর্ম্মপত্নী করিয়াছিলেন—শ্রী পতিরতা, শ্রী সাধ্বী, শ্রী সুন্দরী, শ্রী কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু তাহা-হইলেও সীতারাম তাহাকে সহধর্ম্মিণী করেন নাই। কারণ আমরা পরে পাইয়াছি। তবে তাহা এখানে বলিলেও ক্ষতি নাই—কারণ,কে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছে যে, শ্রী তাহার 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' হইবে। পতিই স্ত্রীর প্রিয়—সুতরাং সীতারাম শ্রীকে গ্রহণ করিলে, তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই, শ্রী বিনাদোষে পরিত্যক্তা। সর্ব্বপ্রথমে দেখিলাম, সীতারাম এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে পরাঙ্মুখ—ভার্য্যাকে, সহধর্ম্মিণীকে প্রাণভয়ে এরূপ পরিত্যাগে তাঁহার অধর্ম্ম, কিন্তু সীতারাম তাহা স্বীকার করিতেছেন। কথাটি সহজ নহে—এই এক কথায় সীতারাম তোমার আমার মত সাধারণ হইয়া যায়। তাই কবি মধ্যে সীতারামের পিতাকে দাঁড় করাইলেন—দেখাইলেন, সীতারাম স্ত্রীত্যাগ করিয়াছেন, পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থে। পিতার কথায় সীতারাম স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেন, কথাটাতে সীতারাম-

চরিত্র বাঁচিয়া গেল—ঘাতপ্রতিঘাত আসিল এবং কাব্যও জমিল। কবি এক হাত দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বিস্মিতচিত্তে আন্দোলন করিতে লাগিলাম—সীতারাম ভাল করিয়াছেন, না মন্দ করিয়াছেন?—পিতার কথায় স্ত্রীত্যাগ, ব্রজেশ্বরও করিয়াছিল—সীতারামও করিলেন। আমরা সীতারামের এ সম্বন্ধে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, সহসা বুঝিতে পারিলাম না—বুঝিতে চেষ্টাও করিলাম না। কিন্তু সীতারাম তাহা পরে স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন,—

"——কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা মাতার পিতামাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি। ইত্যাদি——"

ইহাতে আপাততঃ প্রতীত হয় যে, সীতারাম তাঁহার অনুষ্ঠেয়-কর্ম্ম জানিতেন, বুঝিতেন ও তাহা পরিপালনে যত্নিকও ছিলেন—তবে ঘটনাধীন কিছু দিন তাহার অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন। ইহাতে সীতারামের প্রতি অর্পিত দোষভার এক-দিকে কিছু লঘু হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রন্থকার আর এক গোল বাধাইলেন—আরার এক প্রহেলিকায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে চাহিলেন। সে ব্যাপারটি এই—

শ্রীর বিষয় সীতারাম যেদিন প্রথম ভাবিলেন, সেদিন শ্রী সামান্যা রমণীর ন্যায় সীতারামের নেত্রপথে পতিত হয়েন নাই। একে পরমা সুন্দরী—তার পরে শ্রী সেদিন মাতৃহারা—

একমাত্র সহোদরের প্রাণও যায় যায়, এইরূপ ভাব। অমন সুন্দরী স্ত্রী অমন অবস্থায় পতিতা, তার জন্য ভাবনা না হইবে কেন? তার পরে আবার শ্রীর অপূর্ব্ব বাগ্মীতা—

"দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীনদুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখন অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

ধার্ম্মিক হিন্দু সীতারামের নিকটে অমন অত্যাচারবহুল স্থান-কালে এইরূপ কথা—ধর্ম্মের জন্য না হইলেও সীতারাম যে শ্রীকে এই সকল কারণে গ্রহণীয় মনে করেন নাই, কে বলিতে পারে? তাই সীতারামের শ্রী সম্বন্ধে বিচারটা কঠিন হইয়া পড়িল। কবি কিন্তু কিছু সহজ করিবার চেষ্টা করিলেন—তাঁহার অমন স্নেহের সীতারামকে প্রথমেই তোমরা কর্ত্তব্যবিমুখ দেখিবে, তাহাতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইল; তাই সীতারামের পক্ষে কিছু ওকালতী করিলেন। সে ওকালতী এই—

"তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরশ্মিপ্রতিফলিত কৌমুদীরূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্তনিকুঞ্জ-প্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর একজন বর্ষাবারিরাশি-প্রম-

খিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

"স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে, যে কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটি আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার একদিকে গঙ্গা, একদিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার একদিকে চিত্রা, আর একদিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ—যার একদিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ, তার কি বিপদকে মনে পড়ে?

"তবে সেদিন রাত্রে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢলঢল ছলছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না। তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা-পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সকল বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া গুরুপুরোহিত ডাকিয়া, পিতার আজ্ঞা-লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত। কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি? আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

"তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য,

যে কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নী-ত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্ব রাত্রে যখনই প্রথমে শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল, যে আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবালম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরেব সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। কিন্তু পর-দিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। উচ্ছ-সিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল।"

যদি সত্যবাদী চন্দ্রচূড় ঠাকুরও সীতারামের দোষগুণ পর্য্যা-লোচনা করিতেন, তবু বোধ হয়, এমন রকমের আলোচনা তিনিও করিতে পারিতেন না। কবি একদিকে সত্যের অনু-রোধে সীতারামের দোষ অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না, অন্যদিকে প্রাণপ্রিয় সীতারামকে প্রথমেই একটা দোষী সাব্যস্ত করিতে কোন মতেই তাহার মন উঠিতেছে না। তাই এই অদ্ভুত মন্তব্য। আমাদের বিবেচনায় এই ওকালতী বড়ই সুন্দর হই-য়াছে। পাঠক! আমি ইহাকে ওকালতী বলিলাম কেন, বুঝিয়াছ কি? এই কথাগুলির এক বর্ণও মিথ্যা নহে—অথচ ইহা কঠোর বিচারেরও কথা নহে। সীতারামের পক্ষে যত দূর বলিবার, তাহা ইহাতে বলা হইয়াছে—বৃত্তান্ত সবই বর্ণিত হইয়াছে। এখন তুমি বিচারক, ইহা হইতে সত্য বাহির করিয়া লও। যদি মনে হয়, সীতারামের ইহাতে দোষ ছিল না, কবির এই কথাতেই তাহা পাইবে; যদি মনে হয়, সীতারাম নির্দ্দোষ, ইহাতে তাহারও বীজ পাইবে।

কথা হইতেছিল এই যে, সীতারাম শ্রীর রূপগুণে ভুলিয়াই তাহাকে গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়াছিলেন কি না? কবি বলিতেছেন কি, শুন—"রূপের মোহ! আ ছি! ছি! তা না।" তুমি মনে করিতে পার, তবে ত সীতারাম কর্ত্তব্যের জন্যই শ্রীকে গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন? কিন্তু যদি তোমার কবির এ কথা বিশ্বাস না হয়, তবে তাঁহার পরের কথায় তুমি আর অসন্তুষ্ট থাকিবে না—"তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল।" দেখিলে, কবি কৌশলে রূপের মোহটি কেমন গোলে হরিবোল দিয়া অন্য কথায় মিশাইয়া দিলেন। সীতারাম নিজেও বোধ হয় এই রূপই ভাবিতেন। স্নেহের পাত্র সম্বন্ধে সকলের পক্ষে এইরূপই ঘটে।

আবার দেখুন, কবি বলিতেছেন—"কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি—এমন কি আর হয়?" তুমি মনে করিলে, রূপে না হউক, গুণে মুগ্ধ হইয়া, সাময়িক ঘটনায় বিমোহিত হইয়া সীতারাম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম চক্ষে দেখিলেন; কিন্তু আবার ঐ শুন, কবি কি বলিতেছেন—"তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য যে, কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্ব রাত্রে যখনই শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি।" সীতারাম নির্দ্দোষ বলিয়া আপাততঃ বোধ হইল, কিন্তু "কেবল" কথাটিতে কিছু গোল রহিয়া গেল। এ "কেবল" দুই দিকেই যায়। এটাও গোলে হরিবোল দিবার কথা। তা'

যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা এইরূপই করেন। বিচার তুমি করিবে। কুহেলিকাদণ্ড চালনাতেই ত কবির বাহাদুরি!

সীতারাম দোষী হউন আর নির্দ্দোষই হউন, সে কথা এখন বড় ছোট হইয়া গেল। সীতারামের পাপ থাকিলেও, নানা চেষ্টায় গ্রন্থকার তাহা তোমার সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র করিয়া ধরিলেন। কিন্তু আমরা শেষে দেখিয়াছি যে, সীতারামের চরিত্রের বীজ এই-খানেই পাওয়া যায়। ইহাতেই ত কবিত্ব।

সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম স্থির হইল—প্রথম—গঙ্গারামকে, শ্রীর ভাইকে রক্ষা করা—অথবা ধর্ম্মের সাজ দিয়া বলিতে গেলে, স্বজাতি হিন্দুকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা—দ্বিতীয় কর্ম্ম—শ্রীকে গ্রহণ করা।

সীতারাম প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন—অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুচেষ্টায় সিদ্ধিপ্রদ হইল—গঙ্গারাম বাঁচিল। কিন্তু জানি না, এই কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ ভিন্ন অন্য কোন একটা বাসনা ছিল কি না—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই না হইয়া অন্য হইলে তিনি তাহার জন্য অত চেষ্টা করিতেন কি না; যদি থাকে, তবে সীতা-রামের বিষবৃক্ষের পুষ্টি এই কার্য্যেও কিছু হইয়া থাকিবে। থাক্, অত সূক্ষ্ম বিচার এখন নাই বা করিলাম।

পরের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—সীতারামের শ্রী-গ্রহণ। শ্রী সুন্দরী, দুখিনী, শ্রী বিনাদোষে পরিত্যক্তা, আবার সেই শ্রী এক নূতন ধরণের রমণী। নন্দা বা রমা কেহই সেরূপ নহে—সীতারামের যাহা আবশ্যক, শ্রীতে তাহাই বিদ্যমান। শ্রী সীতারামের রাজ-ধর্ম্মে সহায় হইবার যোগ্যা। "স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্য

বান বলিয়াছেন, আসক্তিশূন্য হইয়া অনুষ্ঠেয় কার্য্য কর। কেবলমাত্র কার্য্য অনুষ্ঠেয় হইলেই হইবে না—তাহাতেও আসক্তি-ত্যাগ চাই। পুত্র-প্রতিপালন অনুষ্ঠেয় কার্য্য, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পুত্রস্নেহে আসক্তি জন্মিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহা অননুষ্ঠেয় মধ্যে পরিগণিত হইল। শ্রীকে গ্রহণ করা সীতারামের ত কর্ত্তব্য কার্য্য ছিলই—যদি সীতারাম তাহার জন্য যথা চেষ্টা করিতেন, কোন প্রকার মন্দ ফলই ঘটিতে পারিত না। কিন্তু সীতারামের সে কর্ত্তব্য কার্য্যও আসক্তিবশতঃ অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল, সীতা-রাম না বুঝিয়া তদ্দ্বারা নষ্ট হইলেন। কথাটি আর একটু পরি-স্কার করিয়া বলিতেছি।

সীতারাম শ্রীকে গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম। শ্রী পলায়ন করিল—'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবে আশঙ্কায় পলায়ন করিল। সীতারাম তাহার অন্বেষণ জন্য লোক পাঠাইলেন; নিজে খুঁজিলেন; সবই ভাল দেখিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, সীতারাম শ্রীর জন্য আত্মহারা হইয়াছেন—শ্রীর সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে আস্তে আস্তে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম, শ্রীর অন্বেষণে সীতারামের চেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গত নহে—ঘোর আসক্তি পরি-পূর্ণ—বোধ হয় (যেমন প্রথমে বলিয়াছি) কিছু অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়া-কাঙ্ক্ষায়ও পরিপূর্ণ। কথাটা আরও পরিষ্কার দেখিতে লাগি-লাম—দেখিলাম, সীতারাম শ্রীর অন্বেষণজন্য "রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া" গঙ্গারামকে তাহার অন্বেষণে পাঠাইলেন; তখন বুঝিলাম, শ্রী রাজকর্ম্ম হইতেও উচ্চে উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কবি একটু আশার বিজলী খেলাইলেন—

বলিলেন—"শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, যে আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন ইত্যাদি।" কাজও একটু দেখিলাম—সীতারাম দিল্লি গমন করিলেন—সেখানে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দেশেও অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভাবিলাম—সীতারামের আর কোন ভয় নাই। সীতারাম ধর্ম্ম-বলে বাঁচিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হরি হরি—আবার এ কি শুনি-লাম—সীতারামের সাধের রাজ্য আজি বিশ্বাসঘাতকতায় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত—তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; শুধু তাহাই নহে, যখন একজন সন্ন্যাসিনী স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল—"যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।" সীতারাম কিছু ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি-লেন, বলিলেন—"তাতেই বা কি?" এই কি আমাদের সেই সীতারাম! কৈ, কবি ত বলিয়াছিলেন, সীতারাম শ্রীকে ভুলিবেন স্থির করিয়াছিলেন; সীতারাম ত কিছুই ভুলেন নাই! ভুলেন নাই বলিলে অতি শান্তভাব ব্যক্ত হয়; সীতারাম যে শ্রীর স্মৃতিতে অন্য সব ভুলিয়াছেন! দেশ যায়—ভ্রূক্ষেপ নাই, বীরপুরুষের ধর্ম্ম যায়—ভ্রূক্ষেপ নাই, সীতারাম উদাসীনের ন্যায় বলিলেন,—"তাতেই বা কি!" পরে আবার যখন জয়ন্তী বলিলেন,—"তুমি কি চাও?" সীতারাম বলিলেন,—"যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?" জয়ন্তী আশ্বাস দিলেন—সীতারাম রাজ্যরক্ষা করিলেন। করিলেন ত বড় কাজই—কিন্তু ইহাতে ত তাঁহার পতনের সূত্রপাতই দেখিলাম। সীতারাম বড় ঘোর আসক্তি-পরবশ—শ্রীপ্রাপ্তিরূপ ঘোর কামনার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন—ইহাকে কি তুমি ধর্ম্ম বলিবে? বলিতে পার,

সীতারাম জয়ন্তীর নিকট ঐ বর না পাইলেই যে চুপ করিয়া থাকিতেন, তাহা নহে—উহা কেবল সময় পাইয়া একটা অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লওয়ার চেষ্টা মাত্র। হউক তাহাই—তাহাতেও ত সীতারাম সমর্থিত হইল না। অমন সময়েও ত শ্রী-প্রাপ্তি মনে আসিল—এই কি রাজা, না রাজার ধর্ম্ম ?

তুমি আমি একদিনেই পড়িয়া যাই—সামান্য ঘর্ষণেই কীটের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু একদিনে প্রকাণ্ড মহীরুহ শুষ্ক হয় না। সীতারাম একদিনে পড়েন নাই—সীতারাম পড়িতে পড়িতেও অসীম বলপ্রকাশে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁহাকে উঠিতে দিল না—সীতারাম কি করিবেন ?

গঙ্গারামের বিচারকালে আমরা প্রথমে মনে করিলাম, সীতারাম সত্যই রাজা—রাজধর্ম্মে অনুরক্ত না হইলে গঙ্গারাম, দর্শনমাত্রেই তাহার কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। কিন্তু সে বিশ্বাস শীঘ্রই তিরোহিত হইল ; জয়ন্তী রাজার নিকট গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, রাজার শ্রী-স্মৃতি উদ্দীপিত হইল। রাজা জয়ন্তীর কথা রাখিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে শ্রীকে চাহিলেন। বুঝিলে পাঠক! না বুঝিয়া থাক—গ্রন্থকারের কথা শুন,—

"কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ড-প্রণেতা হইয়া শ্রীর

লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইয়াছে।"

ইহা আমাদেরই বুঝাইবার কথা—গ্রন্থকার নিজেই তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

পরে সীতারাম শ্রী পাইলেন—কিরূপে পাইলেন, পাঠকবর্গ তাহা জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সে শ্রী ত সংসারীর শ্রী নহে—সে শ্রী ত সীতারামের শ্রী নহে—সে শ্রী ত নন্দা-রমার ন্যায় প্রণয়িনী নহে—সে শ্রী ত রক্তমাংসের শ্রী নহে। সে "স্থির মূর্ত্তি, অবিচলিত ধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুশূন্যা, উদ্ভাসিত-রূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহামহিমাময়ী" দেবী, মানুষী নহে। "হায় মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে?"

পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাই—এমন যে শিবপূজা, তাহাতেও অধিকারীঅনধিকারী ভেদ আছে। সন্ন্যাসীর আরাধ্য শিব গৃহী আরাধনা করিলে, তাহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়—বংশ থাকে না ইত্যাদি। সীতারামের বুঝি তাহাই হইল—এ ত সীতারামের আরাধ্য শ্রী নহে—এ শ্রী লইলে তাঁহাকে যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে! কিন্তু তাহা কি সেই সময় বুঝা যায়?

যাহাকে এতদিন হৃদয়ে আরাধ্যা দেবীর ন্যায় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সীতারামের সেই শ্রী আজি সম্মুখে। সীতারাম ভাবিয়াছিলেন, আজি তিনি কত সুখী হইবেন—প্রেমপ্লাবনে—শ্রীর চ'খের জলে আজি তাঁহাকে অমৃতসাগরে ভাসিতে হইবে। কিন্তু সে শ্রী কি না অবিচলিতচিত্তে অশ্রুশূন্যনয়নে অপরার ন্যায় সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন আমাকে কি করিতে হইবে?" সেই শ্রী কি না আজি সীতারামকে চাহিতেছে না, বলিতেছে—

"যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।" সীতারাম বিস্মিত হইলেন—অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু শ্রীকে ছাড়িলেন না কেন ছাড়িলেন না, পরে বলিতেছি।

শ্রী যাহাই হউন—সন্ন্যাসিনী পরম জ্ঞানবতীই হউন, আর ভৈরবীই হউন, সীতারামের নিকটে তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা শ্রী ভিন্ন আর কিছুই বিবেচিত হইতে পারেন না। সীতারাম ভাবিলেন—শ্রী কি চিরদিন এমন থাকিতে পারিবে? কখনই নহে। আর শ্রীর জ্ঞানোপদেশ কি তাঁহার হৃদয়ে কোন কার্য্য করিতে পারিয়াছিল? সীতারাম বালকের কথার ন্যায়, স্ত্রীলোকের কথার ন্যায়ই তাহা জ্ঞান করিলেন—সীতারাম আবার শ্রীর নিকট কি জ্ঞান শিক্ষা করিবেন? তাই সীতারাম শ্রীকে রাখিলেন—তাঁহার ইচ্ছামতে "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই সময় হইতেই সীতারামের অন্তরস্থ বিষ ক্রমশঃ ক্রিয়া দেখাইতে লাগিল। সীতারাম পূর্ব্বে শ্রীকে হৃদয়ে অর্চ্চনা করিয়াই অধীরপ্রায় হইয়াছিলেন; এখন সে শ্রী সম্মুখে—কিন্তু সীতারাম তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না; সীতারামের অধীরতা ক্রমে বাড়িল। যেরূপে হইল, তাহা গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তারপর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না।

ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্ত-বিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার এবং রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে; শ্রীর বাঘ ছালের নিকট ঘেঁষিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারও চিত্তবিশ্রামে হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

"এদিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।"

বিষ ক্রমে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল—ক্রমে সীতারাম একটু একটু করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। রাজধর্ম্ম গেল—সহধর্ম্মিণী রমা যত্নাভাবে—বুঝি তাঁহার দর্শনাভাবেই—গেল।

এই রমার মৃত্যুতে সীতারাম একটু জাগরিত হইলেন, একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু নিদারুণ ঘটনাচক্র তাঁহাকে আবার নিষ্পেষিত করিল। নন্দার নিকট, চন্দ্রচূড়ের নিকট, তিনিই

রমার মৃত্যুর কারণ —এই কথা শুনিয়া সীতারাম জ্বলিয়া উঠিলেন। (বড়ই সুন্দর কাব্য—গ্রন্থের এই অংশটুকু) সীতারাম নিজেও কিন্তু তাহাই ভাবিতেছিলেন, তাহাই প্রায় স্থিরও হইয়াছিল, তবু নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের কথায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন জ্বলিয়া উঠিল। এমন স্থলে যাহা হইবার তাহাই হইল—সীতারাম নিদারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন—পাপী পাপাচরণ করিতে করিতে কোন মন্দ ফল প্রাপ্ত হইলে যেমন আরও পাপ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হয়, সীতারামেরও তাহাই ঘটিল। যখন লোক নিম্নের দিকে পতিত হয়, তখন জগতেরই বিধানানুসারে প্রতি পদে তাহার পতনের গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সীতারাম নন্দাকে কড়া বলি-লেন—চন্দ্রচূড়কে তিরস্কার করিলেন—আর নিদারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, রাজধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, ঘোরতর অবিচার আরম্ভ করিলেন। এ সব কি সীতারাম করিলেন? তাহা নহে। একটা ভূত যেন সীতারামের কাঁধে চড়িয়া তাঁহার দ্বারা এই সব করাইল। "দেশে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—বাকিদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।" প্রজা সব পলাইল—রাজ্য ছারেখারে যাইতে লাগিল।

এ সব কেন হইল, গ্রন্থকার তাহাও নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন,—

"তাই বলিতেছিলাম, যে আগে আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এখন ঘর পুড়িল; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানি না; কেননা, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে রাজ্যশাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—

থাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, ঙপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। মন দিলেই যে সব আপদ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম; শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরী মধ্যে ।হষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়। কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইয়াছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু থর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজ-পুরীতে মহিষী না থাকিয়া চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসিনীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্ত হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রা-ণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের শ্রী! পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল।"

শেষে শ্রী পলাইল—রাজা সীতারাম কামনা পুরাইতে পারি-লেন না। শ্রীকে অনুদিন দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে যে কামানল জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইতে পারিল না—রাজা প্রাকৃত ক্রোধে মাতিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে—সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ'—দেখিয়াছি। এখন

'কামাৎ ক্রোধাহভিজায়তে' দেখিলাম। ধার্ম্মিক রাজা জয়ন্তীকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন- হইতে সম্মোহ জন্মিল; সম্মোহ হইতে নীতিভ্রষ্ট হইতে লাগিল জয়ন্তীকে নন্দা রক্ষা করিলেন—আবার কামনা প্রতিহত ক্রোধ জন্মিল। গ্রন্থকার লিখিলেন,—

"এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।"

বুঝি শ্রীর উপর ক্রোধাধিক্যই—ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের ক্রোধের ন্যায়—তাঁহাকে পরবর্ত্তী কার্য্যে নিয়োজিত করিল। অথবা অতৃপ্ত ভোগলালসা, শ্রীকে না পাইয়া, চারিদিক ফুটিয়া উঠিল। ধার্ম্মিক সীতারাম পশুর ন্যায় আজ্ঞা করিলেন,—"রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে আত্মবিস্মৃতি ও নীতিবিস্মৃতি, ইহা হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটিল। বুদ্ধিনাশ হইতে সীতারাম বিনষ্ট হইলেন—সে সকল কথা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন।

এখন একবার সীতারামের চরিত্রটী মোটের উপর সমালোচনা করা যাউক। সীতারামকে আমরা প্রথমে দেখিলাম—একটী ধর্ম্মবীর—হাঁ ধর্ম্মবীর বৈ কি! হিন্দুকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি ধর্ম্মবীর নয় ত কি? প্রাণপাত করিয়া, শত সহস্র বিপদ পায়ে ঠেলিয়া, শরণাগতের প্রাণ বাঁচাইতে যিনি একদিন উদ্যত ছিলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলিব না বলিব? যাঁহার স্থাপিত সাম্রাজ্যে সেই সমন্ব-

কার হিন্দুমুসলমানে প্রীতি ছিল, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিব না তবে কি বলিব ? হিন্দুর প্রধান চন্দ্রচূড়, মুসলমানের প্রধান 'াহ ফকির—উভয়েই যাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন,
'র ? সীতারাম সামান্য লোক
দেখাইতে কবি উপন্যাস
য, তাঁহার গোবিন্দলাল,
। থাকিতে পারে। কিন্তু
থলে।—সীতারামের
পতন দেখিলে, নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলালেরও বুঝি তদ্রূপ পতন হয় নাই! আর্য্য কবির ইহাই অভিপ্রেত। সামান্য, অতি সামান্য কারণে, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম পাপে, সীতারামের পতন ঘটিয়াছিল—আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

প্রথমে স্থূলভাবে সীতারামের চরিত্র দেখ। সীতারামের ‌ম পাপ কি ?—না পরিণীতা পত্নীত্যাগ। পরিণীতা ভার্য্যাকে পতৃ-আজ্ঞায় পরিত্যাগ করিয়া, সীতারাম তাহার প্রায়শ্চিত্ত ন্য রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত! এতেও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না ? শ্রীর জন্য সীতারাম কি না করিয়াছেন ? অমন নন্দা ও রমাকেও প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন —অমন রাজার আধিপত্য, রাজার ভোগ, এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন—ইহাতেও কি সে াপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ? তারপরে দেখ, সীতারাম শ্রী ইলেন ; কিন্তু যে শ্রী পাইলেন, তাহা তাঁহাতে শোভিল না— সন্ন্যাসীর শ্রী রাজার গৃহে শোভিবে কেন ? ইহাতে সীতা- দোষ ? বলিবে কি সীতারাম শ্রীকে ত পাইয়াছিলেন,

তবে তাহাকে নন্দা ও রমার মত রাখিলেই পারিতেন—না হয় দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সীতারাম ইহার প্রথমটি পারেন নাই—শ্রীর জন্য; দ্বিতীয়টি পারেন আশার আশায়—অতৃপ্ত ভে দোষ হইল? তাহা নহে কামনা-পরতন্ত্র হওয়া f ইহার নিষেধ দেখাইতে সহবাসে কি অধর্ম্ম দেখাই , ত্বে বিবাহ তবে সংসার কেন? ফল কথা, সীতারাম ভাসিলেন—ঘটনার স্রোতে। শ্রীই তাঁহার পতনের মূল—তাহার দোষ নাই—গ্রন্থকার সত্যই লিখিয়াছেন।

যদি এইখানেই সীতারামকে বিদায় দিতে পারিতাম, তবে মনে বুঝি কতকটা শান্তি হইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে সীতারামের অমন পতনে কেবল ঘটনাচক্র বা দৈব ক দেখিয়া মন স্থির হইতে চাহে না। সীতারামের চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া, সূক্ষ্মই হউক, আর যাহাই হউক, একটা বীজ বাহি হইতেছে। সে কথাটি এই :—

ভগবান বলিয়াছেন যে,—

"ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিভাম্ভসি।"

সংসারীর পক্ষে ইন্দ্রিয় দমন একান্ত আবশ্যক। ইহা কেবল মাত্র সন্ন্যাসীরই অনুষ্ঠেয়, তাহা নহে—সংসারীরও ইন্দ্রি দমন না হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। ফল কথা, প সন্ন্যাসী না হইলে পাকা সংসারী হওয়া যায় না। সীতারা

পরদারনিরত ছিলেন না সত্য, সীতারাম লোভীও না থাকিতে পারেন, সীতারামের অন্য রিপু বশে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কাম রিপু তাঁহার বশে ছিল না। কেবলমাত্র পরদারগমন না করিলেই এই ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছে, এইরূপ অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাহা ভুল এবং কবি সীতারাম-চরিত্রে সেই ভুলও দেখাইয়া দিতেছেন।

শ্রী একদিন সীতারামকে বলিয়াছিল,—"ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখন বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীর সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়-বশ্যতা মাত্রই পাপ।" সীতারাম এ কথা বুঝেন নাই, বুঝিতে চাহেন নাই, বিশ্বাস করেন নাই, বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। এই তাঁহার পাপ। এই পাপেই তাঁহার পতন হইল! রূপোন্মাদ তাঁহার প্রথমেই ছিল—সে বীজটুকু আমরা প্রথম দিনেই সীতারামে দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীর সহিত সীতারামের প্রথম কথা—গ্রন্থমধ্যে সীতারামের প্রথম কথা—"তুমি শ্রী এত সুন্দরী!" যাহা আরম্ভে দেখিলাম, উপসংহারেও তাহাই দেখিলাম। আরম্ভে যাহার অঙ্কুর দেখিয়াছিলাম, শেষে তাহার বৃক্ষ দেখিলাম। এটুকু কবির অসামান্য কবিত্ব। আমরা বরাবরই দেখিয়াছি যে, কবি চরিত্রের প্রথমেই তাহার একটা এমন পরিচয় দিয়া থাকেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা আমরা ভুলিতে পারি না। হউক না শ্রী সীতারামের স্ত্রী—কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে দেখিয়া প্রথম কথাই এই বলেন "তুমি এমন সুন্দরী," তাহার অন্য রিপু বশীভূত হইয়া থাকি-

লেও, রূপ যে রিপুর অস্ত্র, সে রিপু বশে আসে নাই। পরে দেখিলাম, সীতারাম যখন যে ভাল কার্য্যটিও করিয়াছেন, এই রূপ-তৃষ্ণা মিটাইবার ইচ্ছা অলক্ষ্যে এক প্রবল কারণ হইয়া তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিয়াছে। কেবল কি অনুষ্ঠান ভাল হইলেই হইল? তাহা নহে। তাহাতে ফলস্পৃহা, আসক্তি না থাকা চাই। সীতারাম যাহা করিয়াছেন, সকাম হইয়া করিয়াছেন। গঙ্গারামকে মুসলমানের হস্ত হইতে তিনি রক্ষা করেন, শ্রীর মনস্তুষ্টির জন্য; রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করেন, শ্রীকে পাইবার জন্য। থাকুক তাহাতে অন্য আবরণ—আবরণ ত থাকিবেই, কবির যখন তাঁহার হইয়া ওকালতি করিতে হইয়াছে, তখন অত সহজে তাহা দেখিতে পাইবে কে তাহা হইলে কবিত্ব থাকে না—কিন্তু সে আবরণমধ্যে শ্রীর রূপ ভোগতৃষ্ণাটাও নিহিত ছিল। সেই তৃষ্ণাই—ভার্য্যাসম্ভোগের তৃষ্ণাই—সীতারামের পতনের কারণ। যেমন ঘটিকাযন্ত্রের একটি চক্র ঘূর্ণিত করিয়া দিলেই সম্বন্ধ-নিবন্ধন সমস্ত চক্র ঘুরিতে থাকে এবং সেই প্রথম ঘূর্ণিত চক্রও আবার ঘূর্ণিত হয়; যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, আবার ফল হইতে বীজ জন্মে; সেইরূপ তাঁহার সেই তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ, আবার বুদ্ধিনাশ হইতে তৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। বড়ই অপূর্ব্ব এ চক্রঘূর্ণন! তখন সীতারাম ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় চালিত হইতেছিলেন—কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। শ্রীর রূপ দেখিয়া তাহার ধ্যান, ধ্যান হইতে তাহাতে আসক্তি, আসক্তি হইতে তাহার লালসা, লালসা প্রতিহত হইলে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ

স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, আবার তাহা হইতে তৃষ্ণা, ইত্যাদি বা এতদূর না আসিয়াও তৃষ্ণা হইতে ক্রোধ, আবার ক্রোধ হইতে তৃষ্ণা চলিতে লাগিল। শেষে যেমন ঘটিকাযন্ত্রে স্প্রীংয়ে জোর না থাকিলে তাহা চলিতে পারে না, সীতারামও সেইরূপ আর চলিতে পারিলেন না। যতদূর চলিবার, চলিয়াছিলেন ; আর যাইতেনই বা কোথায় ? *

সীতারামের চরিত্রসম্বন্ধে এইখানেই বক্তব্য শেষ হয়। সীতারামের এরূপ তৃষ্ণা কোথা হইতে আসিল, ঘটনা-চক্রে তাহা কেন রিবর্দ্ধিত হইল, তাহা ব্যাখ্যা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে— রণ উপন্যাসেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে।

এখন উপসংহারে সীতারাম চরিত্র হইতে আর একটী তত্ত্ব দেখাইতে ইচ্ছা করি। সেটি সীতারামের পুনরুত্থান। প্রায়ই তে পাওয়া যায় যে, যাহারা ঘটনাক্রমে পাপী হইয়া পূর্ণ- য় পাপাচরণ করিতে পারে, তাহাদের এমনই এক ঘটনা য়া থাকে, যাহাতে আবার তাহাদের পুনরুত্থান-শক্তি জন্মে। নন্তকাল পাপাচরণ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আর বুঝি একের চরম প্রান্তে অপর বিদ্যমান থাকে। তাই বুঝি সীতারাম যখন সব শেষ করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। ঘটনা-চক্রও তখন অনুকূলে বহিল। জয়ন্তী যখন বলিল—"মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না ?

* কবি সীতারামের পতনের কারণ মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যমদ একটী কারণ স্থির করিয়াছেন। দুইস্থলে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি। আমরা তাহার কার্য্য ভাল দেখিতে পাই না,ই বলিয়া তাহা উল্লেখ করি নাই। তবে ঐরূপ একটা কারণ থাকা সম্ভব বটে।

জানেন বৈ কি ? জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায় অগতির গতিকে মনে পড়ে না ?"

"সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয় মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে সূর্য্যরশ্মি বিকশিত হইতে লাগিল—চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'নাথ! দীননাথ অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আ পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি করিবে না ?"

"সীতারাম অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিতেছেন দে শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুইজনে মঞ্চের জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, উর্দ্ধনেত্র হই ডাকিতে লাগিল—গগনবিহারী গগনবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দি কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারিদিগ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,—

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥"

"দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ, মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে; দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন শব্দশূন্য—

তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বরসম্বাদিনী অতুলিত কণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল,—

"নমো নমোঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ॥"

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন—আসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেলেন; যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।

এমনটি কিন্তু (অদৃষ্টবান না হইলে) তোমার আমার ঘটে না ষ-সীতারামের ন্যায় ধর্ম্মবীরেরই এইরূপ ঘটিতে পারে।

সীতারাম-চরিত্রের আর একটি ভাব বিশ্লেষণ করিলেই—আমরা যতদূর বুঝি, তাঁহার চরিত্রের সবই দেখা হয়। সেটি শ্রীর প্রতি তাঁহার আসক্তি।

শ্রীর প্রতি সীতারামের আসক্তি সম্বন্ধে ভক্তিভাজন গ্রন্থকারের সহিত আমাদের একটু মতভেদ আছে। অথবা মতভেদ বলি কেন—গ্রন্থকারের তৎসৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধীয় মন্তব্য পাঠকের বিশ্বাস করা উচিত নহে; কারণ, দুই একস্থলে তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় মতেই পাঠককে মনোহর বাক্-বিন্যাসে ভ্রান্তিবিজড়িত করিয়া থাকে। এই ভ্রান্তি-বিস্তারে কবির বাহাদুরী আছে—সুতরাং এ লোভ সহজে পরিত্যাজ্য নহে। সীতারামের চরিত্রের দোষগুণ আলোচনা-স্থলে আমরা কবির এইরূপই একটি মধুর মন্তব্য পাঠ করিয়াছি। এইরূপ মন্তব্য দুই এক স্থলে ঠিক 'ম্যাক্‌বেথের' ডাকিনীর কথার মত—দুইই উহাতে থাকে, সত্যও

থাকে এবং একার্থে মিথ্যাও থাকে; কারণ, তাহার যে অর্থ শ্রোতা প্রথমে গ্রহণ করেন, সে অর্থ প্রকৃত নহে।

শ্রীর প্রতি সীতারামের আসক্তিতে নির্দ্দোষ দশটা কারণ বিদ্যমান থাকিলেও, একটা দোষযুক্ত কারণও ছিল—সেটা শ্রীর শারীরিক রূপ জন্য সীতারামের ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা বা মোহ। গ্রন্থকার সীতারামের প্রথম কথাতেই তাহা অতি বিশদরূপে ব্যক্ত করাইলেন—শেষের ঘটনাতেও তাহা অতি প্রকৃষ্টরূপেই প্রকাশ করাইলেন; কিন্তু এমনই তাঁহার সীতারামের প্রতি স্নেহ বা কাব্যসংরক্ষণের চেষ্টা যে, তাঁহার মন্তব্য-মধ্যে তাহা কোন স্থানেই সুপ্রকাশিত দেখিতে পাইলাম না। তিনি কি উহা বলেন নাই? তাহা নহে; বলিয়াছেন, কিন্তু সমালোচক যের বলেন, সেরূপ বলেন নাই—কবি যেরূপ বলেন, সেইরূপ ন . য়াছেন। তাই, কবির সেই মন্তব্যগুলি একটু যত্নসহকারে পড়িতে হয়।

শ্রী সীতারামের বাল্যসহচরী নহে—তাহার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলেও আদৌ আলাপ-ব্যবহার ছিল না। এরূপ স্থলে, হঠাৎ একদিন দেখিয়া ধার্ম্মিক সীতারাম এত যে মোহিত হইলেন, তাহার কারণ? কবি তাহার এক সুন্দর উত্তর করিয়াছেন। দেখা মাত্রই ভালবাসা হয়, এ ধারণা কবির নাই; তাঁহার কোন চরিত্রেই তাহা দেখিতে পাইবে না। এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি প্রথম হইতেই দেখিতে পাই। যেখানেই তিনি প্রণয়ের—প্রকৃত প্রণয়ের মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, সেইখানেই দেখিবে—প্রণয়িযুগলের মধ্যে প্রায়ই বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটাইয়া পরে প্রণয়ারম্ভ করিয়াছেন। যেখানে তাহা না দেখিবে, সেইখানে হয় বিবাহ

ভিন্ন ও অন্য প্রকার সম্বন্ধ (যথা বাল্যসংসর্গ প্রভৃতি) কারণরূপে দেখিতে পাইবে, নতুবা জানিবে যে, সে প্রণয়ের কলুষিত ভাব দেখানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। যাঁহারা একটু মনোযোগ করিয়া আমাদের কবির উপন্যাসগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই একথা জানেন—আমরা এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার আবশ্যকতা দেখিলাম না। এখানেও তিনি বলিতেছেন,—

"ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে সম্পদে, সুদিনে দুর্দ্দিনে, যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে।"

তবে সীতারামের উপায় ? সীতারাম শ্রীর জন্য যে উন্মত্ত, তাহা ত দেখিয়াছি। সে উন্মত্ততাই যে একপ্রকার পাপ, তাহাও দেখাইয়াছি। যাহা হউক, যদি প্রকৃত ভালবাসায় সেই উন্মত্ততা হয়, না হয়, সে পাপকে সংসারীর চক্ষে কিছু সূক্ষ্ম করিয়াই দেখিলাম। কিন্তু গ্রন্থকার ত সে পথেও বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন; বলিলেন, প্রকৃত ভালবাসা শ্রীর ন্যায় স্ত্রীর প্রাপ্য নহে। তবেই ত একটা দোষের কথা না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই কবি তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ববলে—সীতারামের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত স্নেহবলে, একটা কারণ উপস্থিত করিলেন; আমরা পড়িয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত, পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইলাম। পাঠক ! প্রবন্ধ মনোহর করিবার জন্য এই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিলাম না—যাহা সত্য তাহাই লিখিলাম।

কবি লিখিলেন,—

"কিন্তু নূতন, আর একটি সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময় ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।"

"হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর? তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন। অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত তাহাও অনন্ত। নূতন তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে অনন্তের অংশ।"

দেখ, মাত্রা কতদূর উঠিল!

শতমুখেও বুঝি ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কথাটা এমনই সত্য যে, যেই ইহা পড়িবে, তাহাকেই প্রথমে মস্তক নত করিয়া সীতারামের স্কন্ধ হইতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি নামাইয়া দিতে হইবে। তাহাকে ভাবিতে হইবে যে, শ্রীর প্রতি সীতারামের এই যে আসক্তি, তাহা নূতন-প্রতি হইলেও

দূষিত নহে। কবি এইরূপে সীতারামের পাপ হ্রস্ব করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন—শ্রীর প্রতি তাঁহার আসক্তিতে রূপোন্মাদ দোষটা একেবারেই প্রচ্ছন্ন অথবা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় অধর্ত্তব্য বলিয়া রাখিতে সমস্ত প্রতিভা নিয়োজন করিয়াছেন। কেবল যে এই স্থলেই তাহা করিয়াছেন, তাহা নহে—এক স্থলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—এক স্থল এই বলিতেছি—আর এক স্থল পরে দেখাইব।

আমরা দুই-চারিবার তাঁহার কথায় প্রথমার্থে ভুলিয়া না গিয়াছি, তাহা নহে; কিন্তু পরে সে ভুল রহিতে পারে নাই। ভুল রহে নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে কি গ্রন্থকারের প্রতি সেই ভুলাইবার চেষ্টা-জন্য বিরক্ত হইয়াছি? কণামাত্রও নহে। পূর্ব্বে ভুলিয়াও সুখী হইয়াছিলাম, পরে ভুল অপসারিত হওয়াতে আরও সুখী হইলাম! দেখিলাম, কবির কি অদ্ভুত ক্ষমতা। এরূপ সত্য কথা দ্বারা ওকালতি জগতে কয় জনে করিতে পারেন?

নূতনত্বের সম্বন্ধে কবি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। কিন্তু তাহাতে রূপের কথাটা ত গেল না! যাহার ভালবাসা নাই, সেও নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে—যেমন সীতারাম লালায়িত, ঠিক সেইরূপই লালায়িত হইয়া থাকে। ঘরে যাহার সাক্ষাৎ রতি বিরাজিতা—এরূপ লোককেও অপর সুন্দরী রমণীর ভোগ-তৃষ্ণায় আকুল দেখিয়াছি। সেটাকে কি সমর্থন করা যায়? তাহা নহে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীর প্রতি সীতারামের যে আসক্তি, তাহাতে প্রথমে রূপ—পরে গুণ কারণ-রূপে ক্রীড়া করিতেছিল। গুণের যে মোহ, তাহাও রূপ হইতে সঞ্জাত—

"সিংহবাহিনী মূর্ত্তির" স্মরণেও রূপ প্রথমে, গুণ পরে। কবি তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু মন্তব্যটি পড়িলে যেন বোধ হয়, সীতারামের উহাতে কোন দোষই ছিল না। অথচ মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য—একবর্ণও মিথ্যা নহে। কবি সব কথাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, সত্য বজায় রাখিয়া, অথচ কাব্য জমাইয়া, মন্তব্যটি লিখিলেন। পাঠক, এখন সত্য করিয়া বল দেখি, এমন কাব্য আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

সীতারামকে স্থূল পাপী করিলে কাব্যই থাকে না, অথচ সীতারামের কার্য্য ও পরিণাম যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপই বজায় রাখা চাই—নতুবা উদ্দেশ্য থাকে না, তাই কবি স্থানে স্থানে আমাদিগকে কুহকজালে আবৃত করিয়াছেন। সমালোচকগণ বলেন, এই কুহকই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

আর এক স্থলে দেখ—

কবি লিখিতেছেন—"শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিবেন।" কথাটি শুনিয়া তোমার আমার প্রথমে কিছু বিস্ময় হইল—কারণ গ্রন্থকারই একস্থলে লিখিয়াছেন—"একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে, তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।" যাহার প্রতি বল-প্রয়োগ করিতে হইবে, নিশ্চয়ই তাহাকে যন্ত্রণা দিতে হইবে। তখন তাহার প্রতি ভালবাসার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাই গ্রন্থকার আবার লিখিতেছেন,—

"তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বল-প্রয়োগ বড় পামরও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়-বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বল-প্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা পারিতেছিল না। বল-প্রয়োগ করিব কি না,—এ কথার মীমাংসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক ওদিক স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম একপ্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সে উদ্যানক সময়ে বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে রাজপুরুষেরা শূলে গেল——রাজ্য ছারে-খারে যাইতে লাগিল!"

দেখিলে—সীতারামকে তোমাদের নিকট কিরূপ প্রতিপন্ন করিতে কবি চেষ্টা করিতেছেন! সীতারাম শ্রীর প্রতি বল-প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছেন, তবু কবি তাঁহার সেই দোষক্ষালন-কত চেষ্টা করিলেন। সে দোষ কেন, সেই দোষকে ভিত্তি করিয়া আরও দশটা দোষক্ষালনের চেষ্টা হইল। সীতারাম যদি ঐ সময়ে আত্মজিজ্ঞাসু হইতেন, তবে এই রকমই তর্ক বিস্তার করিতেন—জগতে কত শত শিক্ষিত পাপী এইরূপ পাপ সূক্ষ্ম করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে চাহে; কবি তাহাই তোমাদিগকে বলিলেন, বুঝাইলেন—কিন্তু সরলভাবে নহে। অথচ তুমি সরলভাবেও একটা কিছু বুঝিলে—ঐ চাতুর্য্যে এইরূপ সরলতার আবরণ থাকিলে, কাব্য-চাতুর্য্যই প্রস্ফুটিত হয়।

সীতারামের আসক্তির যেটুকু ভাল অংশ (যদি আসক্তির কিছু ভাল থাকিতে পারে), সীতারাম যেটুকু সহ্য করিয়াছিলেন—যেটুকু আত্মদমন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা

দেখাইতে চাহি না; কারণ, সে পক্ষে কবির প্রখর দৃষ্টিই রহিয়াছে। আমরা কেবল সীতারামের চরিত্রের দোষভাগই প্রদর্শন করিলাম। কারণ, কবির তাহা মুখ্য লক্ষ্য হইলেও, তাহা কাব্যঘটায় কিছু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাহা প্রচ্ছন্ন, তাহারই প্রদর্শন আমাদিগের মুখ্য কার্য্য।

সীতারামের পাপপুণ্য সমালোচনা শেষ হইল। আমরা দেখিলাম, সীতারাম তোমার আমার ন্যায় সামান্য মানুষ নহে—আমরা দেখিলাম, সীতারামের পাপের প্রকৃতি তোমার আমার অনুষ্ঠিত পাপের মত নহে—আমরা দেখিলাম, সীতারামের অধঃপতন তোমার আমার ন্যায় অধঃপতন নহে। পাপ ছোট, লোক বড়; অথচ পতন কেন এত বড় হইল, জানিতে চাহ কি? এ কথা একদিন আমরা "চন্দ্রশেখর" ও "আর্থার ও গুইনিভিয়ার" পুস্তকদ্বয় তুলনায় বলিয়াছি, আজ এখানে অতিরিক্ত দুই এক মাত্র কথা বলিব। সীতারামের ঐরূপ পতনকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিলে দোষ কি? ঐরূপ পড়িলেন দেখিয়াই, সীতারামকে ভগবান আবার কোলে তুলিলেন—ঐরূপ পড়িলেন বলিয়াই, সীতারামের আবার উত্থান-শক্তি জন্মিল। নতুবা তুমি আমি যে অনুদিন তিল তিল করিয়া পতিত হইতেছি, সেই রকম পড়িলে সীতারাম আর উঠিতেও পারিতেন না। দেখিলাম—যেমন ঘটনাচক্র তাঁহাকে পাতিত করিয়াছে, তেমনই ঘটনাচক্র আবার তাঁহাকে উঠাইয়াও দিয়াছে! ঐ উত্থান ও পতন উভয়ই সুন্দর! ঐ পতনে সীতারামের যাহা পাপ, তাহা বলিয়াছি—বিবাহিতা ভার্য্যার প্রতি ভোগলালসা। তাহাতে কি এমন পতন হয়? তোমার আমার ত হয় না! হইবে কেন?—তোমার

আমার কি ঘরে শ্রী আছে, যে ঐরূপ পতন ঘটিবে? পতন আমাদেরও হইতেছে, কিন্তু শ্রী নাই বলিয়া অমন উত্থান-পরিণামী পতন হইতেছে না। এই শ্রী থাকা-রূপ সীতারামের অদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট বশতঃই সীতারামের পতন ও উত্থান ঘটিল। ইহাতে শ্রীর কোন অপরাধ ছিল কি না, তাহা শ্রীচরিত্র সমালোচনা কালে বলিব। এখানে ইহাই বলি যে, এই জন্যই কি হিন্দুশাস্ত্রে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের পাপপুণ্যের ভাগী বলিয়া থাকে? তা' বলিতে পারে। যখন একের কার্য্যের ফল অন্যে এতদূর বর্ত্তিয়া থাকে, বর্ত্তিতে পারে, তখন এ কথা বলিলে প্রলাপ বলা হয় না। শ্রীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী না হইয়া যদি প্রফুল্লের মত সহধর্ম্মিণী হইত, রমার ন্যায় সহধর্ম্মিণী না হইয়া যদি শান্তির মত সহধর্ম্মিণী হইত, তবে এই সীতারাম রায় দ্বিতীয় জনক ঋষির ন্যায় গীতার আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করিতে পারিতেন।

২। শ্রী।

এই শ্রীর চরিত্র বড়ই দুর্ব্বোধ্য। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গকে বলিতেছি। সংশয় কিন্তু সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই।

বঙ্কিম বাবুর এই শেষ তিন খানি উপন্যাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি স্ত্রীচরিত্র, যথা—শান্তি প্রফুল্ল, নিশা, শ্রী ও জয়ন্তী, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসসমূহের স্ত্রীচরিত্র হইতে দুই এক বিষয়ে

বড়ই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যদি সময় হয়, এ কথাটি একটু বিস্তৃত করিয়াই বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের একটিমাত্র বিশেষ পার্থক্যের কথা বলিতেছি।

শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী ও জয়ন্তী—ইহাদের শিক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের। এখন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষায় সচরাচর যাহা প্রতিপাদন করে, আমি সেরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার কথা বলিতেছি না। কাব্য, সাহিত্য, গণিত, অলঙ্কার এ শিক্ষাব বিষয় নহে—ঘরকন্না ও দাম্পত্য প্রেমও এ শিক্ষার লক্ষ্য নহে। এ শিক্ষার লক্ষ্য অতি উচ্চ—এ শিক্ষার বিষয় অতি মহান্। হিন্দুগণ, শুধু হিন্দুগণই বলিয়াই বা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় কেন দিব—সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণই যে শিক্ষাকে চরম শিক্ষা বলিয়া থাকেন, এই সকল স্ত্রীচরিত্র সেই শিক্ষাতেই সুশিক্ষিতা। যে নির্ম্মল নিষ্কাম ধর্ম্ম ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—যাহার মত কি ঐহিক কি পারলৌকিক, কি বৈজ্ঞানিক কি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ইহ জগতে কখন প্রকাশিত হয় নাই—হইতেও পারে না, যে শিক্ষার লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি, বিষয় চিত্তশুদ্ধি প্রফুল্ল, নিশা, শ্রী ও জয়ন্তীতে আমরা সেই শিক্ষারই পরিচয় পাই য়াছি।* তোমার সূর্য্যমুখীই বল, ভ্রমরই বল, এই সকল স্ত্রীচরিত্রের তুলনায় তাহারা অতি সামান্যা রমণী। সহরে পাঁড়াগাঁয়ে যত প্রভেদ—সাগরে নদীতে যত প্রভেদ, পর্ব্বতে ও বালুস্তূপে যত প্রভেদ, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপই বুঝি প্রভেদ লক্ষিত

* শান্তিচরিত্রে সে শিক্ষা তত পরিস্ফুট না হইলেও, তাহার অস্তিত্ব যে অনুমান করা যায়।

হয়। যাহা হউক, সে কথাটা এখন বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নহে—এখন ইহার উল্লেখ মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই উচ্চশিক্ষারই বিভিন্ন প্রকৃতি, অবস্থাধীন তাহার বিভিন্ন পরিণাম, এই উপন্যাসত্রয়ে বুঝান হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই তিনখানি উপন্যাস একই মহা উপন্যাসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

নিদাঘের নির্ম্মেঘ গগনে দিবাকরের যেমন প্রোজ্জ্বল ও নির্ম্মল জ্যোতি, শরতের সুনীল আকাশে শশধরের যেমন শুভ্র ও শীতল রশ্মি, ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটি স্ত্রীচরিত্রে ঠিক তেমনই প্রোজ্জ্বল, তেমনই নির্ম্মল, তেমনই মধুর, তেমনই শীতল ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকশিত দেখিয়া হৃদয় আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া যায়। আবার মধ্যাহ্নের দিবাকরও যেমন মধ্যে মধ্যে মেঘমালায় আবৃত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া যায়—পূর্ণিমার শশধরও যেমন কাল কাদম্বিনীর ছায়ায় মধ্যে মধ্যে আচ্ছাদিত হয়—ইহাদের মধ্যে কাহারও চরিত্র সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব তেমনই কখন ঈষৎ তমসাচ্ছন্ন, ভ্রান্তি-বিজড়িত, কখনও বা অজ্ঞান ছায়ায় আবৃত হইয়া, সেই শুভ্রকৃষ্ণ দুই পৃষ্ঠই অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করি-। জানি না, ধর্ম্মের এমন সূক্ষ্ম সমস্যা অন্য কোন জাতির স এমন বিবৃত ও ব্যাখ্যাত আছে কি না—কিন্তু বলিতে য় যে, এমন উপন্যাসের অবতারণ একমাত্র ভারতেই অন্যত্র নহে।

ত জ্ঞানের পথ অতি জটিল, অতি দুর্গম। হিন্দুশাস্ত্র- এই কথা বলিয়া থাকেন। কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'পন্যাস গুলিতে ইহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ড়ে পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে বিশেষ সতর্কতার

প্রয়োজন, একটু অসাবধান হইলেই তাহাকে সুনীচে পতিত হইতে হয়, তেমনই ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক—সামান্য সতর্কতার অভাবে তাহাকে অধঃপতিত হইতে হয়। তবে একটা প্রভেদ এই আছে যে, যে পাহাড় পর্ব্বত হইতে পতিত হয়, সে আর বোধ হয় ইহজন্মে তথায় উঠিতে পারে না—কিন্তু ধর্ম্মের শিখর হইতে কাহারও তেমন পতন হইলে, তাহার উত্থানও অবশ্যম্ভাবী। পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠিতে গেলে কেহ তাহাতে সাহায্য করে না—কি ধর্ম্মশিখরে উঠিতে গেলে, একজনের প্রখর দৃষ্টি তাহার উপ পড়িয়া থাকে। তিনি পতিত হইলেও ধর্ম্মশিখর-আরোহণেচ্ছুকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া দেন। ধর্ম্মের শিখরে ভ্রমণ করিতে আ রোহণ ও অবরোহণ দুইই অনেক সময়ে তুল্য শ্লাঘ্য—সে ব সীতারাম-চরিত্রে দেখান হইয়াছে।

প্রফুল্ল প্রভৃতি চরিত্রে এই শিখরারোহণ যেমন সহজ বিপত্তিশূন্য দেখিয়াছি, আমাদের এখনকার বর্ণিতব্য শ্রীচা তেমন অধিরোহণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে উ পতন, অধিরোহণ অবরোহণ, জ্ঞান ও ভ্রান্তি তুল্যভাবেই ও এই অংশে শ্রীর চরিত্র আবার এই শ্রেণীস্থ অন্যান্য চরি হইতে পৃথক্। আমরা এখন তাহাই দেখাইতেছি।

শ্রীর জীবনে তিনটি পরিস্কার ছেদ দেখিতে পাও প্রথম ছেদে তাহার গৃহিণী জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কথাটা এখানে কিছু অপরিস্কার বোধ হইতে পারে হউক—তবু প্রথম ছেদের শ্রীকে গৃহিণীই বলা যায়। পরিচয় এইরূপ—"সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের ম

ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।”

গ্রন্থমধ্যে শ্রীর সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আমাদিগকে গ্রন্থকার এইরূপ দেখাইয়াছেন—

“ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। *শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, ‘হে নারায়ণ, হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক—পাপিষ্ঠা। আমা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও ঠাকুর।”

ধর্ম্মপ্রাণা শ্রীর ইহা অপূর্ব্ব আরম্ভ বটে।

ইহার পরে শ্রী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রণয়-ভিখারী ভাবে নহে—স্বামি-সহবাসে বঞ্চিতা বলিয়া স্বামি-সহবাস লাভেচ্ছায় নহে—স্বামীকে স্নেহ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবার জন্যও নহে—ভ্রাতার জীবন উদ্ধারের জন্য। সেই ভ্রাতা শ্রীর অত্যন্ত প্রিয়—সহোদর কোন্ সহোদরের অপ্রিয়ই হয়, শ্রীর ত তাহাতে আবার সেই সহোদরের আশ্রয়েই বাস।

* বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথাগুলি সর্ব্বত্রই আমরা এইভাবে মুদ্রিত করিয়াছি।

শ্রী ও সীতারামের সেই কথোপকথন পাঠকবর্গ একবার স্মরণ কর। তাহাতে একটা অতি সুন্দর কথা আছে। সীতারাম যখন বলিলেন—"উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।" শ্রী বলিলেন—"দেখ দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?"

ইহা পড়িয়া পাঠক কি মনে করিতেছ ? শ্রী সীতারামের সহবাসে বঞ্চিতা বলিয়া তৎপ্রতি সমধিক আসক্তি-শূন্য—ভ্রাতার প্রতি বেশী স্নেহশালিনী, ইহাই কি তোমার মনে হইতেছে ? না, শ্রী ধর্ম্মপ্রতি এতই আস্থাবতী, যে সীতারামের ঐরূপ ধর্ম্মজনক কার্য্যে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা শ্রী কিছুই মনে করিতেছে না, ইহাই ভাবিতেছ ? যাহাই ভাবিয়া থাক, কথাগুলি মনে রাখিও —গ্রন্থকারের কোন চরিত্রের প্রথম পরিচয় ভুলিবার সামগ্রী নহে।

ইহার পরে শ্রীকে দেখিলাম—সেই কবর-ক্ষেত্রে। এখানে শ্রী যাহা করিয়াছিল, তাহার ফল সীতারাম-চরিত্রে দেখিতে পাই-য়াছ, এখানে সে কথা সম্বন্ধে কিছু বলিব না।

শ্রীর জীবন-নাটকের প্রথম ভাগের বিশেষ বর্ণিতব্য বিষয় —তাহার পতিপ্রেম। আমরা এখন সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি, দলনী প্রভৃতির পতিপ্রেমে যেখানে বিকাশ —এই শ্রীর পতিপ্রেম সেইখানেই আরম্ভ

কথাটা পরিষ্কার হইল না। আমি বলিতেছিলাম এই যে, ঘটনার পর ঘটনা আনিয়া এই সকল স্ত্রীচরিত্রে পতিপ্রেমের যে বিকাশ গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসে দেখাইয়াছেন—শ্রীর পতিপ্রেমের আরম্ভেই পতিপ্রেমের সেই বিকশিত অবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। সূর্য্যমুখী প্রভৃতির বিকশিত পতি-প্রেমের উচ্চতর স্তর এই শ্রীর পতিপ্রেমে প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, কোন বলের বিরুদ্ধ বল উপস্থিত হইলেই তাহার পরিমাণ হইতে পারে। প্রণয়েরও সেইরূপ। কাহার পতিপ্রেম কত বড়—বুঝিতে হইবে, কাহার পতিপ্রেমবিরোধী অবস্থা কত বেশী, তাহা দেখিতে হইবে। নগেন্দ্রনাথের সূর্য্য-মুখীকে পরিত্যাগ, কুন্দকে গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য সূর্য্যমুখীর পতি-প্রেম-বিরোধী—সূর্যমুখীর পতিপ্রেম সে বিরোধে জয় লাভ করিল, তাই সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেমের একটা পরিমাণ আমরা বুঝিলাম। শ্রীর পতিপ্রেমও এই প্রকার বিরুদ্ধ বল দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। সেই বিরুদ্ধ বল অতি প্রবল। সূর্য্যমুখীর প্রণ-য়ের বিরুদ্ধে যে বল ছিল, শ্রীর প্রণয়ের বিরুদ্ধে তাহা ত প্রথমে ছিলই তাহাপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী বলও ছিল। সেই কথা এখন বলিতেছি।

প্রথমে দেখ—সীতারাম বিবাহ করিয়াও বিনা দোষে শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বা গ্রহণ করেন নাই। সেই যে জ্যোতিষের কথা ছিল, তাহাও শ্রী কিন্তু প্রথমে জানিত না পরে, শুধু গ্রহণ করেন নাই, এমনও নহে; শ্রীকে বাস্তবি লোকের পত্নী হইয়াও সামান্য অন্নাচ্ছাদনেও যেন ক

হইত, এরূপ ইঙ্গিত গ্রন্থে দেখিতে পাই। এ সকলই শ্রীর বিনা দোষে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথ-কুন্দ সম্বন্ধীয় প্রণয়ে বিরোধী ছিলেন বা হইতে পারেন এইরূপ একটা ভাব পোষণ করিয়া, নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে কিছু কষ্ট দিয়াছিলেন—ভ্রমর বিনা কারণে গোবিন্দলালকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-দমনের এত চেষ্টা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহাকে সময়ে অসময়ে কর্কশ বাক্য দ্বারা তাড়না করিত বলিয়া, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—কিন্তু শ্রীর কানই দোষ ছিল না—তবু তাহাকে সীতারাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু দেখ সেই শ্রীর পতিপ্রেম—

"জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব ?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ—কিছুই কি মন দিবার নাই ?

শ্রী। পাপে ?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে ?

জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই র স্বামী—আর কেহ নহে।

ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও কননা তিনি সকলের স্বামী।

আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহ দুঃখ, আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভাল বাসিয়াছিলে, তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল—

'তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলে হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে?

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, 'যদি একত্রে ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁর দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আ

দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মন ভার, অকুশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুণ এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দিয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিন ভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী, কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।'

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।"

দেখ এই পতিপ্রেমের প্রাবল্য! জয়ন্তী এই পতিপ্রেমের বিরুদ্ধে কত বড় প্রেম ধরিলেন—শ্রী কিন্তু এখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ইহাতেই বুঝিতে পার, শ্রীর পতিপ্রেমের প্রাবল্য প্রথমাবস্থায়ই কিরূপ ছিল। এই প্রেমই প্রকৃত বিশুদ্ধ পতিপ্রেম। পতির রূপ গুণ হইতে এ প্রেমের উৎপত্তি হয় নাই, পতির রূপগুণের অভাবে এ প্রেম বিনষ্টও হইতে পারে না।

`প্রেম কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত—হিন্দু শাস্ত্রে বা সামাজিক

'ণী স্বামী প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতেই সঞ্জাত।

সীতারামের যে খণ্ডে শ্রী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আরম্ভে লিখিত আছে—

প্রথমখণ্ড।

দিবা।

গৃহিণী।

শ্রীর জীবনের দ্বিতীয়চ্ছেদ আমরা এইরূপ দেখিলাম,—

শ্রী সীতারামকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কারণ তাহার কোষ্ঠিতে আছে যে তিনি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবেন। স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়—সুতরাং শ্রী হইতে সীতারামের প্রাণের আশঙ্কা আছে। যখন শ্রী সীতারাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তাবস্থায় ছিলেন, তখনও শ্রী গৃহিণী ছিলেন—তখনও তাহার মনে আশা ছিল, একদিন স্বামী গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন—কিন্তু এখন আর সে আশা নাই—এখন শ্রীর আর কোন আশাই নাই।

সংসারে যাহার সুখের আশা বিলুপ্ত হয়, একবার সন্ন্যাসের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত তাহার সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণীয় বা সংসার-ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এরূপ কোন ধারণা তাহার না থাকিতেও পারে, তবু সে সন্ন্যাসের দিকে ধাবিত হয়। যেমন সংসার-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট হতভাগ্য দুই একটি মানব পরলোকে কি হইবে না হইবে, তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াও আত্মহত্যা দ্বারা ইহলোকের ব্যাপার শেষ করিয়া ফেলে—তেমনই সন্ন্যাসে কি

আছে না আছে তাহা না জানিয়াই অনেক সংসারসুখে নিরাশ ব্যক্তি সন্ন্যাসের দিকেই ধাবিত হইয়া থাকেন। উপস্থিত অবস্থা কষ্টদায়ক, তাই তাহা ত্যাজ্য, ইহাই এইরূপ ত্যাগের প্রথম কারণ। শ্রীরও তাহাই ঘটিল। শ্রী উর্দ্ধশ্বাসেই যেন সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন—যে সংসারে থাকিলে তৎকর্ত্তৃক সীতারামের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা যে সংসারে স্বামি-সহবাস-সুখ হইতে চিরদিন তরে বঞ্চিত হইতে হইবে—সে সংসারে শ্রী থাকিবেনই বা কেন ?

শ্রী সংসার ত্যাগ করিয়া, সীতারামকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন। পথে অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর সমবয়স্কা, কাজেই উভয়ের মধ্যে অল্পেই প্রণয় জন্মিল। জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী—তিনি সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ব্রতাবলম্বন করিয়াছেন। সেই জয়ন্তী এখন শ্রীর দুঃখনিবারণে সচেষ্ট হইলেন। এই জয়ন্তীর শিক্ষাই শ্রীর জীবননাটকের দ্বিতীয়চ্ছেদের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। আমরা এখন তাহাই বলিব।

জয়ন্তী শ্রীকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত গ্রন্থে নাই। তবে সে শিক্ষার কি ফল ফলিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সে শিক্ষার প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারে। শ্রী চরিত্রোপরি সেই শিক্ষার ফল কিরূপ হইতেছিল, তাহা নিম্নের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

"মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী এক হস্তীগুম্ফা মধ্যে প্রবেশ করিল.—শ্রী, তত্ক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহ

করিয়া চন্দন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরে এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

"মহাপুরুষ কি অদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রী বলিল—'কি মিষ্ট পাখীর শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!'

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তরতর গদ্‌গদ্‌ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। অনেকদিন, স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।"

"জয়ন্তী বলিল—'এখন শুনিলে তেমন ভাল লাগিবে না কি? শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?'

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?'

"জয়ন্তী। * * * তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই পতিপ্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও আমাকে বুঝাও। তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মারিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে, আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন, আমারই হইতে তাঁহার সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে! আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্র পারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহা তাঁহার বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।"

"জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে ভাবিতেছ কেন?'

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনে আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্টির ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্যা?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে কি বৈতরণীতীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কতগুণে বাড়িয়াছে তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্যা?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইরা সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? (পরে স্বে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন বন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন ন্য সনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন কি তাঁর হইবে না?"

ইহাতে আমরা দেখিলাম—দুইটি বিরুদ্ধ বলের অপূর্ব্ব সংঘ। শ্রীর পতিপ্রেম কিরূপ ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি —এখন জয়ন্তীর শিক্ষায় শ্রীর ভগবৎ প্রেম বা দিব্যজ্ঞান কিরূপ ন্মিতেছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম। দুইই প্রায় তুল্য—কিন্তু র অদৃষ্ট-দোষে দুইই পরস্পর বিরোধী। সংসারী, পতিব্রতা শ্রী কবার মনে করিতেছিল—স্ত্রীর পতিই গতি, পতিই ঈশ্বর—পতিবের সুখ-বিধানই স্ত্রীর একমাত্র কার্য্য; আবার জয়ন্তীর শিষ্যা ্যাসিনী শ্রী ভাবিতেছিল—পতিরও একজন পতি আছেন, ন পতি হইতেও বড়, পতির সুখই বা কি—সুখমাত্র করিতে হইবে—সুখ দুঃখ উভয় পরি

মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। এই দুই "শ্রী"র অপূর্ব্ব সমাবেশ এই অপূর্ব্ব কথোপকথনে আছে। এই কথোপকথন-কালে, শ্রী ভিতরে জয়ন্তী, কিন্তু ভিতরেরও অতি ভিতরে সেই শ্রী—ভিতরে সন্ন্যাসিনী, কিন্তু ভিতরেরও অতি ভিতরে সেই পতিপ্রাণা রমণী—ভিতরে জ্ঞান, কিন্তু ভিতরেরও অতি ভিতরে ভক্তি। তখন শ্রীর একদিক দিবা—অন্যদিকে নিশা; জয়ন্তীর শ্রী পাখীর সুমিষ্ট রবে, প্রকৃতির মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিল—স্বামীর কণ্ঠস্বরও সেই সময়ে সেই শব্দের সহিত তুলনীয় মনে হইল না—মনে হইল, সেই বিহগের আরাব, সেই শিখরতলস্থ বহমান নদীর তর তর গদ্ গদ্ শব্দেরই তুল্য; জয়ন্তীর শ্রী বলিতেছিল—"অনেক দি স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।" জয়ন্তীর শ্রী তেছিল, এখন আর তাহার পতিসন্দর্শনে শুভাশুভ সুখ ; জয়ন্তীর শ্রী বলিতেছিল "কে কারে মারে বি ..কিছুই না।" আবার শ্রীর শ্রী—সীতারামের শ্রী বলিতেছিল—"আমার সুখ দুঃখ নাই—...দুঃখ হইবে না?" এই শ্রীর শ্রীর নিকট জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন শুনিলে তেমন ভাল লাগি না কি?' "শ্রীচুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে,মুখ তুলিয়া জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল 'কেন ঠাকুর কি আমাকে পতি-সন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?' শ্রীর পক্ষে বড় ভয়ানক এই শিক্ষা-ব্যাপার—এই শিক্ষায় ফলে শ্রীকে দুইদিব হইতে দুইটি প্রবল বল প্রবল বলে আকর্ষণ করিতেছিল; এ দিকে সীতারাম ও সংসার—অপর দিকে জয়ন্তী ও সন্ন্যাস। এ টানিতে বুঝি শ্রী শ্রীহীন হইয়া পড়িল, এই টানাটানি শ ঘটিল।

এই টানাটানিটা আমরা একদিন ভ্রমর-চরিত্রে ছিলাম, কিন্তু তাহা এত স্পষ্ট নহে; তাহা কিছু কাব্যে বেশী আচ্ছাদিত। কিন্তু শ্রীর এই টানাটানিটা বড়ই একদিকে সংসার—অন্যদিকে সন্ন্যাস—একদিকে পতি, অ ভগবান্, একদিকে সীতারাম, অন্যদিকে জয়ন্তী। টা করিয়া শ্রীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছিল। এম এমনই করিয়াছিল যে, শ্রী ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হই আছে কেবলমাত্র জয়ন্তীর শিষ্যা; এই টানাটানির ফলই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন পাঠক ভাবিয়া দেখ—বঙ্কিম বাবুর এই উপন্যাস ।
ন কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস। পতিপ্রেমের আদর্শ নির্ম্মাণ কে
ক.মর্যা, এখন কবি উচ্চতর স্তরে অধিরোহণ করিতেছেন। এ
তিনি দেখাইতেছেন—সেই পতির পতিপ্রেম—ভগবদ্ভক্তি—নি
জ্ঞান। এখন সংসারে যাহা আছে, তাহা লইয়াই ত এই
শ্রেষ্ঠ কবি বসিয়া থাকেন না, তাঁহার মহীয়সী কল্পনা বর্ত্ত
ড়িয়া, ভবিষ্যতের অনেকদূর ভেদ করিয়া থাকে। পতিপূজ
া একমাত্র পূজা—পতিসেবাই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম—এই কথা
রণ রমণীকে সহজে বুঝাইতে পারা যায়। কিন্তু রমণীর
যখন উচ্চতর হইবে—যখন এই পতির পতিকে
। সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে চাহিবে, তখন তাহাদের কি হইবে
ই প্রদর্শন করিতে এই সকল স্ত্রীচরিত্রের অবতারণা।
শিক্ষিতা রমণীগণ সীতা, সাবিত্রী, সূর্য্যমুখী, কমল-
হজেই আদর্শ মনে করিতে পারে, কিন্তু জয়ন্তীর ন্যায়
প্রফুল্লের ন্যায় শিক্ষি—

,জ তাহা পারে না। তাঁহাদের চিত্তে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভাব উপস্থিত হয়, সেই ভাবের বিচিত্র লীলা এই ,পন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। এমন গভীর তত্ত্ব—জগতে জাতির উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না। জ্ঞান-রমণীর নিকটে একদিকে পতি, অন্যদিকে সেই পতিরও ; একদিকে সুখ ও সংসার, অন্যদিকে সুখদুঃখবিরহিত র বা সন্ন্যাস স্থাপন করিয়া কবি কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই প্রদর্শন াছেন। তাঁহার মত ভাল না মন্দ, সে কথা আমরা বলিতে না, কিন্তু সেই মত সমর্থনার্থ তাঁহার কি অপূর্ব্ব কাব্য-কৌশল ়াই আমরা বলিতে চাহি। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পতিকে স্ত্রীর াকটে ভগবানের তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতে বলিয়াছে রূপ উপদেশের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারি, এমন ..ও ামাদের নাই। তবে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, যে দেশে

রুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ
়রেব পরংব্রহ্ম—

লয়া কথিত হয়, এ উপদেশ সেই দেশেরই বটে। এ সম্ব গ্রন্থকারের মত আমার অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া বেশী লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। যাহ বলিলে নয়, তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানে ভক্তিতে—দিবায় রজনীতে এই টানাটানির ফলে জীবনে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল—শ্রী জীবনের সেই সায়ংকা স্তীর সঙ্গে নিম্নলিখিত কথোপকথন করিলেন।

"জয়ন্তী বলিল, 'শ্রী আর দেখ কি? এক্ষণে স্বা

সই জন্যই কি আসিয়াছি।

। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জর্ষি কর না কেন।

মার কি সাধ্য ?

। আমি বুঝি, যে তোমা হইতেই এই মহৎকার্য্য সিদ্ধ

ারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে

?

জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে

ধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া

।। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে

—কিন্তু মরে না। রত্ন তুলিয়া আনে।

আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না।

ক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছু দিন

ইখানেই থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি

চত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ

াইব, স্থির করিয়াছি।

এব শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না"

. এই ইতস্ততঃ ভাবই তাহার জীবনের সন্ধ্যা—জয়ন্তীই

াার কারণ (যেমন শ্রী সম্বন্ধে গ্রন্থের এই খণ্ডগুলির

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা গেল—সীতারাম সম্বন্ধে ঠিক সেই

াখ্যা করা যায়। ফলতঃ সীতারামের সুখ দুঃখ এক

। শ্রীর কার্য্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। এ কথা আমরা

াম-চরিত্র ব্যাখ্যাস্থলে এক প্রকার বলিয়াছি—কিন্তু

গ্রন্থের এই খণ্ডগুলির নামের ব্যাখ্যা তাহাতে নাই।)

—তাই সীতারামের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে লি

দ্বিতীয় খণ্ড।

সন্ধ্যা।

জয়ন্তী।

এখন শ্রীর জীবনের তৃতীয় ছেদের কথা বলিব।

জয়ন্তীর শিক্ষার ফলে, শ্রীর পরিণাম কি ঘটিয়া অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছেদে আরম্ভ দেখিয়াছিলাম, এই ছেদে সেই ফলের উ দেখিলাম।

যোদ্ধার যেমন রণশিক্ষা, এই দ্বিতীয় ছেদেও সেইরূ জ্ঞানশিক্ষা; যোদ্ধার যেমন রণক্ষেত্র—এই তৃতীয় ছেদও শ্রীর কার্য্যক্ষেত্র। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে প্রফুল্লে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাই নাই—এখন যাহা তাহাতেই শ্রী ও প্রফুল্লের প্রভেদ দেখিতে পাইব।

প্রফুল্ল বাহিরে অমন উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানশিক্ষা করিয় স্বামী ব্রজেশ্বরের গৃহধর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত কি

শ্রী কিন্তু করিল তাহার বিপরীত। শ্রী সীতারামের মহিষী হইতে স্বীকৃত হইল না—শ্রী মনে করিল, মহিষী পদ এখন তাহার যোগ্য নহে—সে এখন সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস ধর্ম্মেই অধিকারিণী। এই বিশ্বাস, এই ভ্রান্তিই সীতারামের পতনের কারণ হইয়াছিল এবং শ্রীকেও পতনোন্মুখ করিয়া দিয়াছিল। সেই কথাই এই অধ্যায়ের একমাত্র বর্ণিতব্য বিষয়।

প্রথমে গীতার শ্লোকগুলি পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিব। (সীতারাম ২।৩ পৃষ্ঠা দেখ) ভগবান্ এই শ্লোকগুলিতে যাহা বলিয়াছেন, শ্রীর তাহা বুঝিতে ভুল হইয়াছিল। অথবা শ্রী তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিল। আসক্তিশূন্য হইয়া যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাই সাধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা। একেবারে কর্ম্মত্যাগী হইয়া থাকিতে পারে না।—তাহাকে অন্ততঃ শরীরযাত্রানির্ব্বাহার্থও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। বাহিরের কর্ম্মত্যাগ—কর্ম্মত্যাগ নহে। মনেরও কর্ম্মভাবনা ত্যাগ চাই। সে অতি কঠিন ব্যাপার—তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "তুমি কর্ম্ম কর, কিন্তু ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে কর্ম্ম কর। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহার অনুষ্ঠানই ভগবানের প্রীতিজনক কার্য্য। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।" বাহিরে অলস হইয়া কর্ম্মত্যাগী হইলেই তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায় না।

জয়ন্তীও শ্রীকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাহার এক প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। জয়ন্তী তথায় শ্রীকে সীতারামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর দুই স্থল নিম্নে দেখাইলাম।

"জয়ন্তী বলিল, তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন?

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী রাজধানীতে যাও। রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ এ তোমারই কাজ।"

অন্যত্র—

"শ্রী। তবে, এখন কি কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে তুমি সন্ন্যাসি তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি নাই যে অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না? স্বামি-সেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?"

কিন্তু শ্রী ত ইহা বুঝিতে পারে নাই। তাই সে সীতারামের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া তাহার পতনের কারণ হইল।

শ্রী কেন এই ভুল বুঝিয়াছিল, তাহার একটা উত্তর আছে। সেই উত্তরও গ্রন্থের একটা তত্ত্ব; শ্রী তাহা এইরূপে বলিয়াছে—

"বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দুলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম—সে দিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট যেন ঠিক উল্টা পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে?"

এই গ্রন্থমধ্যে যাহা দুর্ব্বোধ্য,তাহাই এই অদৃষ্টতত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সকল কার্য্যের কারণ পরম্পরা বুঝা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। স্বয়ং জয়ন্তীও বলিয়াছেন "আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই, অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণ-পরম্পরা বুঝিয়া উঠি।'

এই অদৃষ্টতত্ত্ব বা জ্যোতিষের সেই শ্রীর প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার কথা হইতেই এই উপন্যাসের আরম্ভ—ইহাতেই এই উপ-ন্যাসের শেষ। সে কথা পারি ত অন্যত্র বিস্তৃত ভাবে বলিব।

শ্রী মনে করিয়াছিল, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। এই বুদ্ধিই তাহার ভ্রান্তিজনক। তাহার কারণ নিম্নে বলিতেছি।

প্রথমে দেখ—শ্রী হিন্দুরমণী। হিন্দুরমণীকে হিন্দুশাস্ত্রানু-যায়ী কার্য্য করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে পতিযুক্তার সন্ন্যাস নাই, কিন্তু সন্ন্যাস একটা উচ্চ ধর্ম্ম মনে করিয়া, শ্রী এ শাস্ত্র-শাসন লঙ্ঘন করিতে সাহস করিয়াছিল। এ কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, শ্রীর এই সাহস কিছু মন্দ কার্য্যের জন্য নহে। তবু ভগবান বলিয়া গিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্সজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রামাণস্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

১৬ অধ্যায়—২৩। ২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, শাস্ত্রবিধি-অনু-

সারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। জয়ন্তীর পক্ষে সংসার-ত্যাগ ও সন্ন্যাস যেমন শাস্ত্রবিহিত, শ্রীর পক্ষে সন্ন্যাস তেমন বিহিত ছিল না। শ্রী সেই অবিহিত ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গোলে পড়িয়া ছিল।

শ্রীর পক্ষে সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত নহে কেন? এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—যাহার মাতা, ভার্য্যা, অপোগণ্ড শিশু প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তাহার সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারত্যাগ নাই। যে রমণীর স্বামী বর্ত্তমান, তাহারও সন্ন্যাস নাই। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, চৈতন্যের সন্ন্যাস, বুদ্ধের সন্ন্যাস, কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ সন্ন্যাস ছিল? তাহা নহে। ইহাদিগের সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাসই ছিল—কারণ ইহাদিগের বাহিরে যাহাই থাকুক, ভিতরে ইহাদিগের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এরূপ কেহই ছিল না। যাহার অন্তঃকরণ সম্বন্ধশূন্য, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস অবিহিত হইবে কেন? শ্রীর কিন্তু সেরূপ পতি-সম্বন্ধ-শূন্য অন্তর ছিল না, বুঝি পতিযুক্তা কোন রমণীরই কখনও তাহা থাকিতে পারে না; তাই শ্রীর পক্ষে সংসার ত্যাগ অবিহিত ছিল।

এই উত্তরে যাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহারা অন্যবিধ উত্তর দেখুন। ভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে সিদ্ধিপ্রাপ্তি কষ্টকর—কারণ শরীরের ও মনের উভয়বিধ কার্য্যই কেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে নাই বলাই বাহুল্য। শ্রীর বাহিরের কর্ম্ম ছিল, মনের কর্ম্মও ছিল।

যাঁহারা গীতাশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাঁহারা সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস-পাঠে কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারিবেন না।

সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস হইতেই পারে না। তবে কার্য্য ত্যাগ না করিয়াও এক প্রকার কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের ফল পাওয়া যায়। ভগবান বলিয়াছেন, আসক্তিশূন্য লাভালাভ বিবেচনা এবং সুখদুঃখজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিলেও সন্ন্যাসের ফল পাওয়া যাইতে পারে। শ্রী তাহাও পারেন নাই। সীতারামের মহিষী হইয়া তাঁহার রাজকার্য্যের সহায়তা করাই শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ছিল। কিন্তু শ্রী সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন—সুতরাং শ্রীর এই সংসারীর সন্ন্যাসও অপালিত রহিল।

তবেই দেখিতে পাইলাম, শ্রী সংসার-ধর্ম্ম পালনের জন্য সংসার-ত্যাগই মাত্র করিতে পারিয়াছিলেন; তাহাও সম্যক প্রকার নহে; কর্ম্মত্যাগ করিতে গিয়া, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই ত্যাগ করিতেছিলেন, সকল প্রকার কর্ম্ম নহে। এই বুদ্ধি, এই ভুল, এই শিক্ষা, এই অদৃষ্ট জন্যই শ্রীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইল।

এই ভ্রান্তিবশতঃ সীতারামের যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। শ্রীর কি হইতেছিল, তাহা দেখাইতেছি। নিম্নোদ্ধৃত জয়ন্তী ও শ্রীর কথোপোকথন পাঠকবর্গ একবার পড়িয়া দেখুন,—

"জয়ন্তী এখন উপায়—

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্ম পত্নী।

জয়ন্তী। তাত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে। আবার কি ভালবাসায় ফাঁদে পড়িব? তাই আগেই বলিয়াছিলাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া বার জন।

জয়ন্তী। আর এগার জন আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি। যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইতেছ দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি। একে কি বলে সন্ন্যাস?"

দেখ গ্রন্থকার কত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম তোমাদিগকে দেখাইতেছেন। শ্রী স্বামীর প্রতি একটু আসক্ত, স্বামীর নিকটে আসিয়া একটু ইন্দ্রিয়বশ হইয়াছিল বলিয়া আপনাকে পাপী মনে করিতেছে—পতনোন্মুখ মনে করিতেছে! ফলতঃ গীতোক্ত ধর্ম্ম এইরূপই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বটে।

কথাটা কিন্তু সত্য। সকল অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়-বশ্যতা পাপ-জনক। সীতারামের শ্রী-আসক্তিও পাপপূর্ণ—শ্রীরও পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পাপজনক! এ কথা হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি বলে নাই—বলিতে পারে না—এ কথা হিন্দু-কাব্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির কাব্যে প্রদর্শিত হয় নাই, হইতেও পারে না।

শ্রীর দোষের ভাগটা ত দেখাইলাম। এরূপ দোষ দেখিয়া অনেক পাঠকই চমকিয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রী যাহা বলিয়াছে—সেই কথা একবার স্মরণ করিয়া, এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মপথে ভ্রান্তি এবং ধর্ম্মশিখরে উঠিতে পতনও কম শ্লাঘ্য নহে।

শ্রীর যাহা ভুল ছিল, তাহা বলিয়াছি। এখন সেই ভুল সত্বেও শ্রীর যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, শ্রী যাহা হইয়াছিল, তাহাই বলিব।

শ্রী ছিল কি? পতিপ্রাণা এক গৃহস্থ রমণী। হউক না কেন তাহার পতিপ্রেম সাগরের তুল্য, তবু তাহাকে সামান্যা মানবী ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়। কিন্তু জয়ন্তীর শিষ্যা সেই শ্রী কি আর সে মানবী ছিল?

জয়ন্তীর শিক্ষায় শ্রীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই লক্ষগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যখন শ্রী জয়ন্তীর নিকট হইতে প্রেরিত হইয়া সীতারামের নিকটে উপস্থিত হইলেন, "তখন সীতারাম উন্নমুখে, স্পন্দিততার লোচনে, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন, যে স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিতধর্ম্মসম্পন্না অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী মহামহিমাময়ী এ যে দেবী প্রতিমা। বুঝি এ শ্রী নহে।"

আবার দেখ—

"আলাপটা কি রকম হইল মনে কর? রাজা বলিতেন, ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এতদিন যে দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহার কথা, শ্রীভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছু নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে

কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারির কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

"শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ হইল। কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে —শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্য প্রস্ফুটিত প্রাতঃ পুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ;—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রীর প্রকৃতির শোভা মূর্ত্তিমতী। তার পর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়।—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়?"

সুশিক্ষার এই ফল—ধর্ম্মচর্য্যার এই পরিণাম।

এখন পাঠক বল দেখি, তোমার সূর্য্যমুখী, দলনী, ভ্রমর, কমলমণি—কেন আমরা তাহারও উচ্চে যাইব—সীতা সাবিত্রী, দ্রৌপদী দময়ন্তী, এইরূপ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন কি? এ কথায় তোমরা অনেকে আমার উপর চটিবে জানি—কোথায় শ্রীর কি খুঁত আছে, না কি নির্লজ্জতা আছে, হিন্দুসমাজের নিয়মলঙ্ঘন আছে, তাহাই আমাকে শ্লেষের সহিত দেখাইতে যাইবে। তা যাহাই কর, আমি যাহা বলিলাম তাহা পুনর্ব্বার বলিব শান্তি, শ্রী, প্রফুল্ল, নিশা ও জয়ন্তীর চরিত্র অন্য কোন দেশে কল্পিত হয় নাই, হইতেও পারে না; অন্য দেশে কেন, এরূপ চরিত্র ভারতেরও কোন কাব্যে এখন পর্য্যন্ত কল্পিত হয় নাই।

শিক্ষার তারতম্য অনুসারেই, কল্পিত আদর্শেরও তারতম্য হয়। যে পর্য্যন্ত দাম্পত্য প্রেমই জীবনের সার বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সামান্য আহার বিহার ঘরকন্নাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া ধরা যায়, সেইপর্য্যন্তই সূর্য্যমুখী প্রভৃতি চরিত্র ভাল লাগে। শিক্ষা একটু উচ্চ হইলে, মন একটু উন্নত হইলে সে ভালবাসার কাহিনী বালকের চাপল্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। প্রৌঢ় পাঠকদিগকে এ কথায় সাক্ষী মানিতেছি।

বলাবাহুল্য জীবনের এই ভাগেই শ্রীর বিষম ভ্রান্তি ঘটিল। জীবনের এই ভাগেই শ্রী 'ডাকিনী'র ন্যায় সীতারামের সহিত আচরণ করিয়া নিজকে পতনোন্মুখ করিল—এবং সীতারামকেও পতিত করাইল। দারুণ অদৃষ্টের বশে, জয়ন্তীর ন্যায় অমন একজন শুভানুধ্যায়িনী সত্ত্বেও শ্রীর ও সীতারামের এই দুর্দ্দশা ঘটিল। দুরদৃষ্ট বটে! কিন্তু পরিণাম ভাবিয়া ইহাকে শুভাদৃষ্টও

বলা যায়। জীবনের এই ভাগ "সীতারাম" উপন্যাসের যে ভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আরম্ভে লিখিত আছে—

তৃতীয় খণ্ড।

রাত্রি।

ডাকিনী।

এখন শ্রীর জীবনের উপসংহার ভাগের কথা বলিব। এই উপসংহারে শ্রী নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন—সীতারামের মহিষী হইয়া অনাসক্তভাবে তাঁহার রাজধর্ম্মের সহায়তা করাই যে তাহার কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন, জয়ন্তীর শিক্ষা তিনি প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সহজে বুঝেন নাই—জয়ন্তী যখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তখনই বুঝিলেন। বুঝিয়া যাহা করিলেন—নিম্নোদ্ধৃত অংশ পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে সেই বেশে, সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, 'তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?'

"জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্‌গদকণ্ঠ সজললোচন কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে

পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

"রাজা তখন বলিলেন, 'শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?

"শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে, নন্দা যাইবে প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ। যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার এই আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,—

"এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

'এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর

সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। আমায় আবার গ্রহণ করিবে!

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, 'আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।'

তার পরে শ্রী জয়ন্তীর উপদেশানুযায়ী কিরূপে সীতারামের মনে ঈশ্বরভক্তি সঞ্চারিত করিল, কিরূপ সেই ঘোর বিপদের সময়ে তাঁহার বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়বিধ জয়-সংসাধন করিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন—এখানে আর তাহার উল্লেখ করিব না।

এখন উল্লেখ করিব—একটী কথা। শ্রীর চরিত্র দুর্ব্বোধ্য বলিয়াছি কেন।

যদি সীতারাম ও শ্রীর এই মিলনেই গ্রন্থ সমাপ্তি হইত তাহা হইলে শ্রীকে এক প্রকার বুঝিতাম। কিন্তু দেখ তাহার পরে শ্রী কি বলিতেছে। "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।" অন্যত্র "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশীই, (এখানে শ্রী সন্ন্যাসীপদে জয়ন্তী ও নিজেকে লক্ষ্য করিতেছে) এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি? আবার শ্রী রাজার নিকট সন্ন্যাসিনী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে কেন? এও না হয় এক প্রকার বুঝিলাম, রাজাকে একটা উত্তর

দিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করা ত চাই—তাই নয় শ্রী এই কথা বলিল। না হয় বলিলাম, শ্রী এখনও সাবেক তাল সামলাইতে না পারিয়া এইরূপ বলিতেছে। কিন্তু শেষে যখন দেখিলাম, শ্রী আবার জয়ন্তীর সঙ্গে কোথায় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, কেহ জানিল না, তখন শ্রীকে কিছুই বুঝিলাম না। শ্রী কি তবে আবারও পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ে সীতারাম হইতে পলায়ন করিল। সে রকম ত কোন কথা কাব্যে পাইলাম না। আর পূর্ব্বে ভয় জন্মিবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়াই, ভয় জন্মিয়াছিল—এখন ত সে সকল কারণ অবর্ত্তমান। তবে শ্রী পলাইল কেন? একবার মনে হয়, সীতারামের বিপন্মুক্তি হওয়াতেই শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম শেষ হইয়াছিল—তাই সে শ্রী জয়ন্তীর সঙ্গে চলিয়া গেল। কিন্তু সেও ত ভাল কথা নহে। জয়ন্তী বলিয়াছিল স্বামি-সেবাই শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তখনও সীতারাম জীবিত, তবে শ্রী কেন আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল? শেষে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে হইল, সীতারাম তখন শ্রীকে আর চাহেন না—তাঁহারও মনে সন্ন্যাস উপস্থিত হইয়াছিল, তাই শ্রী আর তাঁহার নিকট গেল না; কিন্তু কথাটা যেন বড় ভাল লাগিল না—তাই বলিতেছিলাম, শ্রীর চরিত্র নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি নাই।

৩। অন্যান্য চরিতাবলী।

১। জয়ন্তী।

বঙ্কিম বাবুর শেষ স্তরের উপন্যাস—আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে এক প্রকার গীতার ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গীতাতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই কর্ত্তব্য কথিত আছে। অধিকারি-ভেদে এই কর্ত্তব্য বিভিন্ন। কাহারও পক্ষে বা কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা আছে—কাহারও পক্ষে বা কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগের প্রশংসা আছে—কাহারও পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি-সংযুক্ত ভগবানে আত্মত্যাগের প্রশংসা আছে। এই বিবিধ পন্থা মধ্যে ভগবান্ ফলত্যাগপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান, সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভগবানে সমর্পণ করিয়া যথা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই সাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা করিয়াছেন। কবি বঙ্কিম চন্দ্র তাহার পদানুসরণ করিয়া, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট এই পন্থাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া লোক-সমাজে প্রচার করিতে যত্নবান ছিলেন।

এই পন্থার একটি অতি সুন্দর ভাব আছে। এই পন্থার যেন সংসার ও সন্ন্যাস মিশাইয়া ফেলিয়াছে। এই পন্থাবলম্বিগণের সংসারে থাকিয়া—সংসারের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—অথচ তাহার ফলাফলে নিস্পৃহ থাকিতে হইবে। যাহাকে বাহ্য জগৎ বলে, তাহার দিকেও এই পন্থাবলম্বীদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আর যাহাকে অন্তর্জগৎ বলে, তাহার দিকেও এই পন্থাবলম্বীদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই পন্থাবলম্বিগণের একদিকে ইংরাজ জাতিকে আদর্শস্থানীয় মনে করিয়া, বাহ্যজ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির দিতে চেষ্টা করিতে হইবে—অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় মুনি-ঋষিগণকে আদর্শ ভাবিয়া তাঁহাদের ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিতে—এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বাবু বঙ্কিম চন্দ্র মনে করিতেন—ইহাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। তিনি মনে করিতেন, ইংরাজ জাতির সহিত ভারতবাসীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এই আদর্শ স্থানীয় পুরুষ সৃষ্ট হইবে। তাই ভগবানের

বিধানে আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে ইংরাজ কর্ত্তা।

সে অবান্তর কথা যাউক—এখন জয়ন্তীর চরিত্র সমালোচনায় সে কথা বেশী খুলিয়া বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এখন যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট হইবে। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ—ইহাই কবি বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার উচ্চ শ্রেণীস্থ উপাখ্যানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই জয়ন্তী চরিত্রও সেই চেষ্টার ফল মাত্র।

যেমন শ্রীতে, তেমনই জয়ন্তীতে গ্রন্থকার সেই কর্ম্মযোগের ফলাফল দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ—তবে যে সংসারী তাহার বিহিত কর্ম্ম, ও যে সন্ন্যাসী তাহার বিহিত কর্ম্ম এক নহে। শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি ছিল, প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি—তাহার অননুষ্ঠানই শ্রীকে পতনোন্মুখ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রী যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল শ্রীর পক্ষে তাহা ধর্ম্ম না হইলেও, জয়ন্তীর পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম ছিল—গ্রন্থকার ইহা পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রী ও জয়ন্তী এক অর্থে পরস্পর (Duplicate) ছিল। সংসারী ও সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় কার্য্যে কি প্রভেদ—পতিহীনা ও পতিযুক্তার অনুষ্ঠেয় কার্য্যে কি প্রভেদ—সুশিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতার অনুষ্ঠেয় কার্য্যে কি প্রভেদ. শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী—কিন্তু সন্ন্যাসিনী বলিলে সচরাচর যে ধারণা উপস্থিত হয়, জয়ন্তী সেরূপ সন্ন্যাসিনী নহেন। তিনি দিবারাত্রি গাছতলায় বসিয়া গঞ্জিকা সেবনে ও লোকের নিকট পয়সা আদা-

য়ের চেষ্টায় রত থাকিতেন না। তিনি মনে করিতেন, যেখানে কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক, সেখানে কেবলমাত্র ভগবানকে ডাকিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দূর করা যায় না। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন?" তিনি কি প্রকার সন্ন্যাসিনী ছিলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে।

তিনি প্রায় সংসারীর ন্যায়ই সংসারী লোকের সঙ্গে মিশিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। আমরা যেখানেই জয়ন্তীকে দেখিয়াছি, আমাদিগের মনে হইয়াছে জ্ঞান ও পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন জয়ন্তীরূপে নরলোকে বিচরণ করিতেছে। যখন জয়ন্তী শ্রীকে অপূর্ব্ব জ্ঞানশিক্ষা, নিষ্কাম কর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন, তখন তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি-বিভাসিত বদনমণ্ডল স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছি। শুধুই কি জয়ন্তীর জ্ঞান-শিক্ষার প্রশংসা করিব? জয়ন্তীর যেমন জ্ঞান, তেমনই ভক্তি—জয়ন্তী যেমন দেবী তেমনই মানবী। শ্রীর প্রতি তাঁহার অদ্ভুত অনুরাগ—সীতারামের প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব স্নেহ, জনসাধারণের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় বাৎসল্য—তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবুদ্ধি, তাঁহার কৌশল, তাঁহার সরস কথোপকথন, সকলই অতুলনীয়। এ সকল কথা খুলিয়া দেখাইবার স্থান আমাদিগের নাই। তবে জয়ন্তী-জীবনের একটা ঘটনা গ্রন্থকার কিছু জমাইয়া লিখিয়াছেন, আমরা তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতে চাহি।

সেই ঘটনাটা—জয়ন্তীর বেত্রাঘাতাজ্ঞা। যে দিন রাজা

সীতারাম পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়মদে মত্ত হইয়া জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করেন, জয়ন্তী-জীবনে সেই দিন অতি ভয়ঙ্কর দিন। সেই ভয়ঙ্কর দিনের দৃশ্যটি একবার পাঠকবর্গকে দেখাইতে চাহি।

কি জন্য জয়ন্তী এই শাস্তি স্বেচ্ছায় আপনার মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। জয়ন্তী রাজার আজ্ঞায় সভাস্থলে আনীত হইলেন। রাজার আজ্ঞায় তাঁহার বেত্রাঘাত হইবে—কিন্তু তখনও তাঁহার "সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট দেহ; তাঁহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্লভ শান্তি; সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরে সেই মৃদু মধুর মন্দ স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ব বিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দ-হাস্য! দেখিয়া অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল।" শুধু প্রণাম করিল, তাহা নহে। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থলে এমনই জয় শব্দ উঠিল—যে রাজপুরী কম্পিতা হইল। চাণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। প্রথমে এইরূপে জয়ন্তীর জয়লাভ হইল।

এই জয়লাভে জয়ন্তীর একটা পরীক্ষাও হইয়া গেল। সেই কথাটা এখন বলিব।

যাহার যেমন শিক্ষা, তাহার তেমনই পরীক্ষা হইয়া থাকে। স্থূল পাপে প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগের মত সাধারণ মানবেরই পরীক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জয়ন্তীর মত লোকের পরীক্ষা সেরূপে হইতে পারে না। কাহার মন কেমন বিশুদ্ধ, তাহা

সেই মনের বিশুদ্ধতানষ্টকারী অবস্থার সংঘর্ষণেই পরিব্যক্ত হয়। এখন জয়ন্তীর মনের বিশুদ্ধতা স্থূল পাপে বিনষ্ট করিতে পারে না। তাই গ্রন্থকার এইখানে একটা সূক্ষ্ম পাপের প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সে প্রলোভনটা এই।—

দেখ, অহঙ্কার একটা অতি প্রধান রিপু। এ রিপু যেমন তোমায় আমায় আক্রমণ করিয়া থাকে, তেমন সূক্ষ্মভাবে মহা-মহারথিগণকেও আক্রমণ করিতে পারে। তোমরা আমরা না হয়, ধনের, মানের, বিদ্যার, যশের, রূপের, বলের অহঙ্কার করি,—মহারথিগণ না হয়, ধর্ম্মের পবিত্রতারই অহঙ্কার করিয়া থাকেন। তা' এই অহঙ্কারের বিষয় যাহাই হউক, সকল সময়েই ইহা নিন্দনীয়। দ্রৌপদার অহঙ্কার, সত্যভামার অহঙ্কারও নিন্দনীয়। জয়ন্তীর এই অহঙ্কার করিবার একটা সময় উপস্থিত হইল। যখন তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ঘোর সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক জয়নাদে পুরী কম্পমান করিল, যখন জয়নাদে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত চাণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল—তখন জয়ন্তীর মনে একটা ধর্ম্মের অহঙ্কার উপস্থিত হওয়াই সম্ভব; কিন্তু জয়ন্তীর তাহা জন্মিল না।—জয়ন্তী তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন —'জয় জগদীশ্বর! তোমারি জয়! তুমি আপনি এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় ভগবান তোমারই জয়! আমি কে?' দেখিলে পাঠক, কেমন এই পরীক্ষা—কেমন এই পরীক্ষায় জয়ন্তীর জয়লাভ!

এই বিষম পরীক্ষায় প্রথমে জয়ন্তী জয়লাভ করিলেন বটে—কিন্তু একটু পরেই তাঁহার সেই জয় রহিল না। রাজা চণ্ডা-

লকে জয়ন্তীকে বেত মারিতে আজ্ঞা দিলেন—চণ্ডাল অস্বীকার করিল। রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিয়া চণ্ডালকে বলিলেন—'তোমাকে শূলে যাইতে হইবে'—চণ্ডাল, যোড় হাত করিয়া বলিল 'মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।'

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জয়ন্তীর কিছু অহঙ্কার জন্মিল—কিছু ক্ষমতা-প্রদর্শনের ইচ্ছা জন্মিল। এই ইচ্ছাবশতঃ জয়ন্তী চণ্ডালকে বলিলেন 'বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে। আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই, বেত্রে আমার কি হইবে! আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।" চণ্ডাল স্বীকার করিল না। "জয়ন্তী তখন চণ্ডালকে বলিল 'বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।' এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মক্ষঃস্থল তাহাতে প্লাবিত হইল।" * * * "জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চণ্ডালকে বলিল, 'দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

এই প্রদর্শনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। এই অনাবশ্যক ক্ষমতা-প্রদর্শন অহঙ্কারের ফল। ফলতঃ চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, মনের পবিত্রতার জোরে জয়ন্তীর একটু অহঙ্কারই হইয়াছিল। এই অহঙ্কার-প্রভাবে জয়ন্তী জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য চক্ষু আবৃত করুক—ইত্যাদি।"

প্রথম যখন এ সকল পড়িতে ছিলাম, তখন জয়ন্তী যে কোন পাপানুষ্ঠান করিতেছিল, এমন স্বপ্নেও ভাবি নাই। গ্রন্থকার এই কার্য্যের পাপটুকু এমনই সূক্ষ্ম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন! কিন্তু শেষে সব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে ভগবানের নিকট সহজে কড়া ক্রান্তিও রেয়াইত হয় না।

যেমন জয়ন্তীর মনে একটু অহঙ্কারের কলঙ্ক উপস্থিত হইল—অমনি তাহার ফল স্বরূপ লজ্জা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। জয়ন্তী আর কথা রক্ষা করিতে পারে না—বিবস্ত্র হইতে পারে না। তখন জয়ন্তী সব বুঝিল, তাহার চক্ষে জল আসিল। তখন সেই পাপ ক্ষালনার্থ "যুক্ত করে, পবিত্র-চিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারি! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর। নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসজ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না। তাই আমি কাতরে ডাকিতেছি জগন্নাথ। আজ রক্ষা কর।"

অন্যত্র—

"জয়ন্তী প্রসন্ন মনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—'জয় জগন্নাথ! তোমার দয়া অনন্ত। তোমার

মহিমার পার নাই। তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ! বিপদ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না, তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ! আমি এতদিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই যে আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা, কেন না আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া।"

জয়ন্তীর এই প্রার্থনায় তাহার অহঙ্কারের ইঙ্গিতটা আছে। গ্রন্থকার এই অহঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—তিনি যেন বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত নারীদেহ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত লজ্জা পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে—জয়ন্তীরও নহে। জয়ন্তী কিন্তু তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন এই মনে করিয়া, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। জয়ন্তীর এইরূপ ভাবই তাহার অহঙ্কারের ফল।*

তা কথাটা যে দিক দিয়াই দেখ, ফল একই। নারীদেহে লজ্জাত্যাগ অসম্ভব—জয়ন্তী তাহা মনে না করিয়া সেই লজ্জাত্যাগের সংকল্পে ভাগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন বলায়ও সে ফল—অনাবশ্যক ভাবে ধর্ম্মবল প্রদর্শন করিয়া জয়ন্তী ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন, এরূপ বলায়ও সেই

এই সম্বন্ধে শ্রীর মুখে গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমারসন্ন্যাস বিভ্রংশের কথা কেন বল। *

গ্রন্থকারের ভাব, মানুষ মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতেই সমর্থ, ধ্বংস করিতে সমর্থ নহে।

ফল। দুইই বলিতে পারা যায়। এই অপরাধের ফল জয়ন্তী-জীবনে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন উন্নত চরিত্র, তেমনই সূক্ষ্ম পাপ, তেমনই সুন্দর প্রদর্শন! ইহার সকলই সুন্দর!

জয়ন্তীর সহিত ভগবানের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, ভগবান তাঁহার কথা কিরূপ শুনিতেন—ফল দেখিয়া তাহা সিদ্ধান্ত করা যায়। মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বলিতেন, প্রার্থনা তাহাকেই বলে, যে প্রার্থনা পূরণ হয়—চাওয়া তাহাকেই বলে, যে চাঁওয়ায় পাওয়া যায়। এই জয়ন্তী যখন যাহা চাহিয়াছেন, তখনই প্রায় তাহা পাইয়াছেন। তাঁহার সীতারামের রাজ্য-রক্ষার কথা, গঙ্গারামের উদ্ধারের কথা, রমার কলঙ্ক-মোচনের কথা, সেই মহা ভয়ঙ্কর দিনের সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের কথা নাই বা বলিলাম—এই এক দিনের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। সেই দিনকার কথা গ্রন্থকার এইরূপে লিখিয়াছেন।

"জয়ন্তী জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপ-কথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনি সেই পরম পিতামাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার, সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায় বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল 'আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন।' সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া

গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপীর দণ্ডই এই, যে সে দয়াময়কে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে, আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি, যে এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।'"

এই প্রার্থনা ভগবান কিরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। বলাবাহুল্য যে সীতারামের প্রধান উদ্ধারকর্ত্তা এই জয়ন্তী। এই জয়ন্তী নিজে এবং তাহার উপদেশানুযায়ী শ্রী, এই দুই জনেই সীতারামের কর্ণে আবার সেই মধুর হরিনাম প্রদান করাতেই সীতারামের উদ্ধার হইয়াছিল। এই উদ্ধারে যেমন নামমাহাত্ম্য,তেমনই জয়ন্তীর ভক্তিমূলক প্রার্থনা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। সীতারাম যেমন জ্ঞানমূলক তেমনই ভক্তিপ্রধান উপন্যাস। জয়ন্তী যেমনই জ্ঞান তেমনই ভক্তি।

ভগবানে জয়ন্তীর বিশ্বাস অনন্ত। জয়ন্তীর বিশ্বাস—ভগবানকে যে ডাকিতে জানে, তাহার আর বিপদ থাকে না। জয়ন্তীর বিশ্বাস ভগবৎপ্রসঙ্গে যে কর্ণপাত করে, তাহার দুর্ম্মতি অচিরেই বিদূরিত হয়। তাই জয়ন্তী বলিতেছে—'আমি জানি, ডাকিলে তিনি শুনেন—ইত্যাদি" তাই জয়ন্তী বলিয়াছে—

'তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কানে প্রবেশ করিত

না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথায় কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?'

"শ্রী। না। তা, বড় লক্ষ্য করি নাই।

জয়ন্তী। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।"

ভগবৎপ্রসঙ্গে মনোযোগ দিলে—এত দিন ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিয়াও কি সীতারাম অমন হইতে পারিতেন? তাই জয়ন্তী বলিয়াছেন, সীতারাম প্রকৃত পক্ষে ভগবৎপ্রসঙ্গে মন দেন নাই—মন দিয়াছেন শ্রীর রূপলাবণ্য প্রতি।

জয়ন্তী ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য অধর্ম্মাচারীর প্রাণ নিজহস্তে বিনাশ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধর্ম্মের উদ্ধার হইলে, প্রাণি-হত্যাকে মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই জন্যই একদিন তিনি স্বহস্তে গঙ্গারামকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর একদিন রাজার নিকটে সেই অপরাধীর প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ফলতঃ এই জয়ন্তীর চিত্র—সর্ব্বত্রই পূর্ণ—সর্ব্বত্রই বিকশিত, সর্ব্বত্রই জ্যোতিপূর্ণ। এ মহান্ চরিত্র—ভাবিতেও মনে অসীম বিস্ময় ও আনন্দ উপস্থিত হয়।

হায় মা! আবার কবে তোমায় এদেশে দেখিব মা!

এই শ্রী-সীতারাম দম্পতি প্রতি তুমি যে দয়া দেখাইলে, কবে এই নিঃসহায় পতিত, পতনোন্মুখ বঙ্গীয় হিন্দুদম্পতি প্রতি তুমি আবার সেই দয়া দেখাইবে মা?

২। রমা।

বুঝি চক্ষের জল জমাইয়া বিধাতা রমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রমা কাঁদিতে আসিয়াছিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই চলিয়া গেল। যেমন আরম্ভ, তেমনই উপসংহার; যেমন প্রকাশ, তেমনই বিনাশ। বাঙ্গালী এক ফোঁটা চক্ষের জল দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হয়, এমন নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুবর্ষণ দেখিলে, তাহাতে সহানুভূতি কেনই না দেখাইবে? তাই রমা বাঙ্গালী পাঠকের বড়ই মনোরম চরিত্র।

রমা বাঙ্গালীর মনোরম চিত্র বলিয়াই গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে এত যত্ন করিয়া তাহাকে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কি কঠোর প্রকৃতি, তিনি রমার চক্ষের জলে আপনার সূক্ষ্ম বিচার ভুলিয়া যান নাই। রমার অশ্রুপাতে তাঁহারও অশ্রুপাত হইয়াছে, কিন্তু সে অশ্রুপাত রমার জন্য তত নহে, যত রমার সহানুভাবক আমাদিগের জন্য। কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি।

যেখানে পাপ অতি স্থূল—এমনই স্থূল যে সকলেই তাহাকেপাপ বলিয়া বুঝিতে পারে, সেখানেও বেশী চক্ষের জল দেখিলে, আমাদিগের সহানুভূতি প্রকাশিত হয়—অমন পাপী রাবণ ও দুর্যোধনের পতনেও আমরা অশ্রুবর্ষণ করি। অশ্রুবর্ষণ করি সত্য, কিন্তু লোকটাকে ভাল বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যেখানে পাপ এত সূক্ষ্ম যে, প্রকাশিত হইলেও সমাজে দোষ বা ত্রুটি মাত্র তাহার নামান্তর, সেখানে চক্ষের জল দেখিলে আমাদিগের সমস্ত সহানুভূতি সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। তখন শুদ্ধ আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হই না—আমরা সেই চরিত্রের ত্রুটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে মনোহর বলিয়া প্রশংসাও করিয়া থাকি—

স্থানবিশেষে তাহাকে আদর্শ বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের এই ক্রটি অবলোকন করিয়া, তদীয় উপন্যাসে এইরূপ কতকগুলি সূক্ষ্ম পাপ দেখাইয়া, তাহার স্থূল ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—সেই সকল সূক্ষ্ম পাপের বীজেও কিরূপ প্রকাণ্ড অশুভপ্রসূ বৃক্ষ জন্মিতে পারে, তাহ প্রদর্শন করা। এই জন্য তাঁহার উপন্যাসে ভ্রমর, রমা, শ্রীর ন্যায় চরিত্র প্রকটিত হইয়াছে। এমন সূক্ষ্ম ক্রটি অবলম্বনে এমন চিত্র জগতের আর কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। বলিয়াছি ত আমাদিগকে হিন্দু কবি কেবল মাত্র আমোদ জন্মাইতে উপন্যাস লিখেন নাই—তাঁহার উপন্যাস এক প্রকার ধর্ম্মতত্ত্ব।

রমা বড় খাঁটি জিনিস। খাঁটি—অর্থাৎ হিন্দু সমাজে সচরাচর যেরূপ রমণী দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ। সহরের শিক্ষিতার কথা ছাড়িয়া দেও—পল্লীগ্রামে গৃহে গৃহে সহস্র সহস্র চিত্রই এই রমার ন্যায়। এমনই অপূর্ব্ব সরলতা—এমনই অপরিমেয় পতিপ্রেম—এমনই অগাধ পুত্রস্নেহ। যদি পৃথিবীটা শুদ্ধ একটা খেলার জায়গা হইত—যদি বিলাস ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন কার্য্য না থাকিত, তবে এই রমার চরিত্রই আমরা আদর্শ চরিত্র মনে করিতে পারিতাম। যদি অনন্ত কালও সীতারাম এই রমার ভালবাসায় স্নান-পান সমাধা করিতে চাহিতেন, সে অগাধ সলিলরাশি কিছুতেই শুকাইত না—সে অনন্ত প্রেমভাণ্ডার কিছুতেই শূন্য হইত না। কিন্তু বিধাতার বিধানে জগতে কেবলমাত্র ভালবাসাই জীবনের একমাত্র প্রাপণীয় পদার্থ নহে—প্রণয়সলিলে সন্তরণই সংসারের একমাত্র কার্য্য নহে। ভালবাসায় সুখ যাহাই থাকুক মানুষ কেবল ভালবাসা পাইয়াই সুখী হইতে পারে না—তাঁ

একমাত্র সৌখিন বাবুদিগের নিকট ভিন্ন একমাত্র ভালবাসাময়ী রমণীই জগতের আদর্শস্থানীয়া বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এ জগতে স্বামি-প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, তাহাও আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রদর্শন করিয়াছি—পতিকে স্বধর্ম্মপালনে সহায়তা করাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিমুখ পত্নীকে লইয়া ঘরকন্না করিলে কি হয়, সীতারাম উপন্যাসে তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। একদিকে সর্ব্বপ্রকারে সুশিক্ষিতা শ্রী—অন্যদিকে স্থূলবুদ্ধি অশিক্ষিতা রমা, মধ্যে বুদ্ধিমতী কিন্তু অপূর্ণশিক্ষিতা নন্দা বড়ই সুন্দররূপে এ তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালার এ তত্ত্ব জানা একান্ত আবশ্যক, তাই মহাকবি সুসময়ে এই চিত্র কয়েকটি আঁকিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, 'স্বামী স্ত্রী পরস্পরে ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ।'

রমার চরিত্র তাহার প্রথম পরিচয়েই অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন—

"রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি। তাহার চক্ষে এই জগতের যাহা কিছু সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্যকে রমার বড় ভয়। * * * রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন

যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রি দিন রমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া, সীতারাম আর তত রমার দিগে আসিতেন না"

পরবর্ত্তী ঘটনা এই পরিচয়ের বিশ্লেষণ মাত্র।

যাঁহারা স্বাভাবিক চিত্র (?) আঁকিতে জানেন না বলিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি দোষার্পণ করেন, তাঁহারা দেখুন ঠিক স্বাভাবিক (যেমন হিন্দু সমাজে আছে ঠিক তেমনই) এই রমার চিত্র হইয়াছে কি না।

রমার সেই ভয়—'হয় ত তাহারা (মুসলমানগণ) বর্ষা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয় ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয় ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে। খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে।' রমার সেই সান্ত্বনা—"এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন" তাহার সেই চিন্তা—"তবে কি না, রমা তাঁকে আর দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল, আর জন্মে দেখিবে।" আবার রমার সেই ভয় "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে?" সেই মুসলমানের ভয়ে প্রথমে ভাবনা, পরে শয্যাগত হওয়া, সেই মুসলমান-হাতে রাজ্য সঁপিয়া দিয়া প্রাণ ভিক্ষা মাগিবার ইচ্ছা, সেই প্রার্থনা—"হে ঠাকুর! মহম্মদ-

রের ছারেখারে যাক্—আমরা মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি” সেই গঙ্গারামের সহিত পরামর্শ—ইহার সকলই অতি সুন্দর, অতি প্রকৃত, অতি মনোহর। কিন্তু এসকল অতি পরিষ্কার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করা আমাদিগের কার্য্য নহে। আমরা সেই দরবারের বিচারের দিনের কথাই কিছু বলিব।

রমার যেমন ভীরু স্বভাব, যেমন কোমল অন্তঃকরণ—সেই দরবারের ব্যাপারটা তাহাতে কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। স্থলবিশেষে অমন ভীরু চরিত্রও কিরূপে সাহস দেখাইতে পারে, অবস্থা-বিশেষে অমন অল্পভাষী রমণীও কিরূপ বাগ্মীতার স্রোত বহাইতে পারে, অবস্থাবিশেষে কিরূপে অমন কোমলপ্রাণা কামিনীও অমন সিংহীর ন্যায় তেজস্বিনী হইতে পারে, এই দরবার ঘটাইয়া কবি আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়াছেন। সে কথাটা এই :—

বঙ্গীয় হিন্দু রমণীর কোমলতা, নিরীহতা জগৎপ্রসিদ্ধ। যে জাতির পুরুষই অন্যদেশস্থ রমণীর অপেক্ষা হীনবল, হীনতেজ, বলিয়া খ্যাত, সে দেশে রমণীর শৌর্য্য বীর্য্য কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু এই হীনবল, ভীরু, নিস্তেজ, নিরীহ রমণীরও এক অবস্থায় সিংহের ন্যায় পরাক্রম হয়, ফণিনীর ন্যায় ক্রোধ হয়। যখন কোন বলবান পাষণ্ড পশুবলে দৃপ্ত হইয়া এই নিরীহ অবলার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহার প্রবল পরাক্রমও এই অন্যত্র অবলার পরাক্রমের নিকট খর্ব্ব হইয়া যায়। ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সে সময়ে এই অবলার আর প্রাণের মমতা থাকে না—যখন প্রাণের মমতা বিলুপ্ত

হয়, তখন শৌর্য্য কেনই বা না আসিবে? সতীত্ব হিন্দুরমণী এমনই জিনিষ।

হিন্দুরমণী শুধু যে অসতীত্বকে ঘৃণা করে, এমন নহে—সেই অসতীত্বের অপবাদকেও অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করে। এই অপবাদ হইতে মৃত্যুও ভাল, হিন্দুরমণীর ইহাই ধারণা। বাঙ্গালী পুরুষ ভারতের অন্যান্য জাতির নিকট শৌর্য্যে বীর্য্যে হীন হইলেও বাঙ্গালী রমণী এসম্বন্ধে ভারতের অন্য কোন বিভাগস্থ হিন্দুরমণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে। অতি নিরীহ, প্রকৃতই অবলা রমার সেই দিনকার কার্য্যে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে রমা, মুসলমান আসিয়া তাহার ছেলেকে মারিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে অষ্ট প্রহর ভীত থাকিত, সেই রমাকে যখন নন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা রাজমহিষী সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।" "রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর। আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব। নন্দা। 'পারিবে?' রমা 'পারিব—নহিলে মরিব।' এইরূপ বলিল। তার পরে মনে কর, রমার সেই দিনকার সেই বাগ্মিতা—'সেই পরিষ্কার, স্বর্গীয় অপ্সরানিন্দিত তিনগ্রাম-সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত' সেই দিনকার সেই কথা। সেই স্তরে স্তরে উত্থিত সেই বাক্য তরঙ্গ—সেই তরঙ্গের শেষ উচ্ছ্বাস—দেখিবে কি চমৎকার ব্যাপার। এই মনোহর ব্যাপারের

মধ্যে রমার সেই পুত্রমুখদর্শনে সাহসবৃদ্ধি, সেই যে পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় তিনি এমন গুরুতর কার্য্য করিতেছিলেন, তাহারই মুখ দর্শন করিয়া ততোধিক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন—সকলই অতি সুন্দর। ইহাতে রমার কলঙ্ক ভয়—পুত্রবাৎসল্য তুল্যরূপেই প্রকটিত হইল।

রমার যে কি দোষ ছিল, তাহা গ্রন্থকারই বলিয়া দিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন রমা স্থূলবুদ্ধি—অন্যত্র বলিয়াছেন, স্বামী পুত্র প্রতি তাহার অনুচিত স্নেহাধিক্যই তাহার দোষ। এও অবশ্য দোষ সন্দেহ নাই—কিন্তু রমা যে নন্দা বা শ্রী হইতে সীতারামকে বেশী ভালবাসিত এমন কথা আমরা স্বীকার করিব না। সুতরাং অনুচিত স্নেহাধিক্যই রমার দোষ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। আমরা বলিব রমার দোষ—অমার্জ্জিত ভালবাসা। রমা ভালবাসিত সত্য, কিন্তু যে ভালবাসার বলে মাতা সন্তানকে কুপথ্য প্রদান করিবা জীবন নষ্ট করেন এ সেই জাতীয় ভালবাসা। এ ভালবাসা কোন স্থানে পরিমাণে অধিক দেখিলেও, ইহার গুণ বিবেচনায় ইহাকে প্রশংসনীয় মনে করি না। রমার এই অমার্জ্জিত ভালবাসাই—সীতারামকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল—সত্যই সীতারাম ভাবিতেন 'গুরুদেব আমাকে রমার ভালবাসা হইতে উদ্ধার কর।'

রমা মরিল কেন, এ কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মনের ভাব মৃত্যু একটা শাস্তি, তবে রমার ন্যায় স্ত্রীলোকের পক্ষে সে শাস্তির ব্যবস্থা হইল কেন? বলা বাহুল্য রমার অনুচিত ও অমার্জ্জিত ভালবাসাই সেই মৃত্যু আনয়ন

করিয়াছিল। নন্দা\ত মরিল না। যদি মৃত্যু শাস্তিই হয় তবে রমার নিজ দোষেই সেই শাস্তি ভোগ করিতে হইল, একথা বলিলে দোষ কি? চক্ষের জলের প্রাবল্য দেখিয়া গ্রন্থকার এ কথা ভুলেন নাই, তাই গ্রন্থমধ্যে রমার মৃত্যু দেখিতে পাইলাম। এ মৃত্যু সীতারামেরও শাস্তি বটে।

নন্দা—

নন্দা সূর্য্যমুখী জাতীয় স্ত্রীচরিত্র। "মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীতে যেমন সন্তুষ্ট ছিলেন, সীতারাম নন্দাতে তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। গ্রন্থকার তাহার কারণ এই বলিয়াছেন—"কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই?" এ কথা অতি পরিষ্কার—বিশ্লেষণের আবশ্যকতা নাই।

গঙ্গারাম নিরবচ্ছিন্ন পাপের চিত্র। সমালোচকগণ যাহাকে কাব্য-সৌন্দর্য্য বলেন, তাহা গঙ্গারামে প্রকাশিত না হইয়াছে, এমন নহে—তবু এ পাপচরিত্র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে আমাদিগের প্রবৃত্তি হইতেছে না। এই চিত্র ম্লেচ্ছ Iago জাতীয়। অন্য চরিত্রের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজনীয়।

ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা—ইত্যাদি।

ভাষা—

সীতারাম উপন্যাসের ভাষা বড়ই প্রাঞ্জল। ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর ভাষা যেন ক্রমশঃ অধিকতর প্রাঞ্জল হইয়া আসিতে-ছিল। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—রচনার চারিটি গুণ—(১) বিশুদ্ধি (২) অর্থ-ব্যক্তি (৩) প্রাঞ্জলতা (৪) অলঙ্কার। তাঁহার এই সীতা-রাম রচনায় এই প্রথমোক্ত তিনটি গুণ সমধিক পরিমাণেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই প্রাঞ্জলতা গুণ। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ।"

বর্ণনা—

সীতারাম উপন্যাসে ললিতগিরির যে একটী বর্ণনা আছে, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী। যেমন বাহিরের শোভা তেমনই তাহাতে কবির হৃদয়েরও শোভা সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। আর মনোহর তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্ণনা। যখন কোন ভাবে তাঁহার কোন চরিত্র উচ্ছ্বসিত হয়, তখন সেই উচ্ছ্বাসগুলি তিনি এমনই সুন্দর করিয়া পরিব্যক্ত করেন, যে সেই বর্ণনাও যেন সেই ভাবের ন্যায় উচ্ছ্বাসময়া হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া করিতে থাকে। সীতারামের যখন অন্তিমে ধর্ম্মোচ্ছ্বাস হইল—অনেকদিনের পরে যখন তিনি আবার হরিনাম স্মরণ করিলেন, যখন জয়ন্তী ও শ্রী তাঁহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিল, তখনকার বর্ণনা পড়িলে, শরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তর ভক্তিরসার্দ্র হয়, এবং গ্রন্থকারকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

সীতারাম উপন্যাসের ঘটনায় তত জাঁক জমক নাই।

ইতিবৃত্ত।

বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের ১৭ই ফাল্গুন "সীতারাম" উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে "প্রচার" নামক মাসিক পত্রে ইহার কিয়দংশ প্রচারিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি ইহার ৩টি সংস্করণ হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিখিবার সময়ে গ্রন্থকারের ধর্ম্মমত বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে "প্রচারে" গীতার আলোচনা করিতেছিলেন এবং "নবজীবনে" "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছিলেন। তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র"রও কতকাংশ এই সময়ে "প্রচারে" প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের নিকটে বড়ই ঘটনাপূর্ণ এই সময়। ওদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রাচীন হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা দ্বারা অনেক হিন্দুকে মোহিত করিতেছিলেন, এদিকে আমাদিগের কবি বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মকে কিছু সংস্কৃত করিয়া প্রচারের চেষ্টায় স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা নিয়োজিত করিতেছিলেন—ওদিকে মনস্বী অক্ষয়চন্দ্র "নবজীবনে" হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্র আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া নব্য হিন্দু পাঠককে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছিলেন। "সীতারাম" উপন্যাস, সেই হিন্দুধর্ম্মাভ্যুদয়কালের লেখা।

পরিশিষ্ট।

উপন্যাসের স্তর বিভাগ।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসসমূহ প্রধানতঃ তিন স্তরে বিভক্ত। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ইহার প্রথম স্তরে অন্তর্নিবিষ্ট; আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম ইহার শেষ বা তৃতীয় স্তরভুক্ত। অন্যান্য উপন্যাসগুলি ইহার দ্বিতীয় স্তরে স্থিত। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ভাগে ইহার প্রথম

বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর নামক উপন্যাসদ্বয় যে গ্রন্থে বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত হয়, সেই গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—

"পরিশিষ্টে আমরা তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নাতিক্ষুদ্র জীবন চরিত সংযোজনা করিয়া দিব, এইরূপ মানস করিয়াছি। * * * পরিশিষ্টে আরও একটি বিষয় থাকিবে। সেটী ইংরাজী ও বাঙ্গলা নবেলের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। এই ইতিহাস উপলক্ষে আমরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি তুলনায় সমালোচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইব।"

কিন্তু এখন আমরা এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবুর জীবনচরিত লিখিতে নানা কারণে আমরা এখন অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। তাঁহার ছবি দেওয়াও ব্যয়সাধ্য—তাহাতেও আমরা এখন অসমর্থ।

বলিলে ক্ষতি নাই, বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকিতে স্বব্যয়ে আমাদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ছাপাইয়া দিবেন, এরূপ অনুগ্রহ-সূচক কথা বলিয়াছিলেন। জীবন-চরিত সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন, এরূপ বলিয়াছিলেন। এখন তিনি জীবিত নাই—কাজেই মনের সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

স্তরের উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছি; দ্বিতীয় স্তরের কতক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় ভাগের একার্দ্ধে গৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি দ্বিতীয় ভাগের অপরার্দ্ধে গৃহীত হইবে।

এই স্তর-বিভাগের মূল সূত্র আমরা পাঠকবর্গকে নিম্নে দেখাইতেছি।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্তরের উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই, গ্রন্থকার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ এই উপন্যাসগুলি লিখেন নাই। যেমন বিষবৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ উপন্যাস সীতারাম পর্য্যন্ত সকল উপন্যাসেই তাঁহার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হব, এই তিনখানি উপন্যাসে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠকের চিত্তরঞ্জন মাত্র এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ বোধ হয়। এই চিত্তরঞ্জন উপন্যাস মাত্রেরই একটা লক্ষ্য, সুতরাং এই সাধারণ উদ্দেশ্যটাকে উদ্দেশ্যমধ্যে পরিগণিত না করিয়া, আমরা বলিয়াছি যে বঙ্কিম বাবুর প্রথম তিন খানি উপন্যাসের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই। তবে চিত্তরঞ্জন করিতে গিয়া, কোন কোন স্থলে চরিত্র-বিশেষে কোন কোন উদ্দেশ্যের ছায়া পতিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা মূলগ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায় না। কেবল মাত্র সরস ও সুপাঠ্য আখ্যায়িকা, নিষ্কাম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই এই উপন্যাসত্রয়ে গ্রন্থকারের একমাত্র চেষ্টা ছিল। এই সময়েই বনবিহারিণী কপালকুণ্ডলা তাঁহার কল্পনা-প্রসূনে গঠিতা হইয়া লোকলোচনের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই "কপালকুণ্ডলা"ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ফলতঃ উদ্দাম বয়সই কবিকল্পনার বিলাস-লীলাকাল। প্রৌঢ় বয়সে, কল্পনার অনন্ত-

প্রসারিণী বহির্ব্যাপিনী দৃষ্টি সীমাবদ্ধা ও অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টিতে পরিণতা হয়।

এই প্রথমস্তরের উপন্যাস বাঙ্গলা ১২৭১ সাল হইতে ১২৭৬ সাল মধ্যে লিখিত। ১২৪৫ সালে বঙ্কিম বাবুর জন্ম হয়। সুতরাং ২৭ বৎসর বয়স হইতে ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে এই উপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছিল।

প্রথম স্তরের উপন্যাস পাঠ করিয়া যখন পাঠকগণ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত উপন্যাসপাঠে বিশেষ আসক্তি প্রকাশ করিলেন, তখন কবি উপন্যাসের লক্ষ্য স্থির করিয়া চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বক লোকশিক্ষা প্রদানই উপন্যাসের উদ্দেশ্য স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তিনি উপন্যাস লেখা পাঠক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পরে সেই পাঠকদিগকে শিক্ষাপ্রদানই তাঁহার উপন্যাসের ব্রত হইল। লোকশিক্ষাই তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই লোকশিক্ষার বিষয় অনন্ত—কবি এই অনন্ত বিষয় হইতে প্রধানতঃ একটি বিষয় গ্রহণ করিলেন। যৌবন কালে মানবের যে বৃত্তিটি হৃদয়ে বেশী যোগাযোগ করিয়া থাকে, সেই প্রেমই বল, আর কামই বল, অথবা সেই প্রেম ও কাম-মিশ্রিত এক অদ্ভুত যৌগিক পদার্থই বল, তাহাই গ্রন্থকার এই দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি এই স্তরের উপন্যাসে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তির বীজ, বৃক্ষ, ও ফল পাঠকবর্গকে উজ্জ্বল রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন। বলা বাহুল্য যে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির আকর্ষণ প্রধানতঃ এই বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। এই বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই জগতে বিবাহের

উৎপত্তি ও সমাজ-বন্ধনের সৃষ্টি, সুতরাং এই বৃত্তির আলোচনায় সমাজ এবং স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধও এই উপন্যাসে সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে।

এই স্তরের উপন্যাসের আরম্ভ ১২৭৯ সালে, পরিসমাপ্তি ১২৮৮ সালের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে। গ্রন্থকার ৩৪ বর্ষ বয়স হইতে ৪৩ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই স্তরের উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয়ও লোকশিক্ষা। কিন্তু সেই লোকশিক্ষার বিষয়রূপে দ্বিতীয় স্তরে তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৃতীয় স্তরে তাহা কিছু বিস্তারিত হইল। এই তৃতীয় স্তরে তিনি পাঠকবর্গকে শিখাইতে চাহিলেন, সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম। পূর্ব্বে মানব-জীবনের একটী মাত্র সমস্যা—এক প্রেমবৃত্তির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—এখন মানবজীবনের সমস্যাসমষ্টি—"কি করিব?" ইহাতেই তাঁহার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হইল। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী সীতারাম এই তিনখানি উপন্যাসে এই সমস্যারই ব্যাখ্যা—এই ধর্ম্মতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। মানবের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি—তাহা কিরূপে পালন করিতে হয়—তাহাতে বাধা বিঘ্ন কিরূপ উপস্থিত হইতে পারে—এই সকল উপন্যাসে সেই সকল কথা বিবৃত হইয়াছে।

এই স্তরের উপন্যাসের আরম্ভ ১২৮৮ সালে; ইহার পরিসমাপ্তির কথা কিছু বলিতে পারি না। কারণ এ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার পরে অন্য কোন উদ্দেশে নূতন কোন উপন্যাস লিখিয়া যান নাই।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

(প্রাতীচ্য ও প্রাচ্য)

প্রাতীচ্য সমালোচকগণ বলেন, চিত্তরঞ্জন অথবা চরিত্রাদিগত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দ্বারা চিত্তরঞ্জনই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। আমাদিগের মহাকবি বলিয়াছেন, মানব-জীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা লোকশিক্ষাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। চিত্তরঞ্জন সেই লোকশিক্ষা সৌকার্য্যার্থ গৌণ লক্ষ্য মাত্র। এই প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য মত দুইটি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে চাহি।

প্রাতীচ্য সমালোচকগণের মত বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই—তাহাদিগের মতে, উপন্যাসাদি ভোগের বিষয়। সুখবিশেষের উৎপত্তিই ইহার প্রথম ও শেষ কার্য্য। উপন্যাসকে ভোগের বিষয় করিতে হইলে, সুখ-প্রদানে সমর্থ করিতে হইলে, চরিত্রগত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি আবশ্যক। উপন্যাস মানব চরিত্র লইয়া—সেই চরিত্রের পূর্ণতা—স্বাভাবিকতাই তাহার চরিত্রগত সৌন্দর্য্য। সুতরাং উপন্যাসের বিচারে, চরিত্রের এই পূর্ণতা ও স্বাভাবিকতা রূপ সৌন্দর্য্যই প্রাতীচ্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বাগ্রে দেখিয়া থাকেন। প্রাতীচ্যগণ-মতে উপন্যাসকার সুখবিধাতা সুতরাং সম্মানার্হ।

প্রাচ্য সমালোচকগণ বলেন, এমন বলিতে না পারিলেও বলিতে পারি, প্রাচ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার বলেন যে, উপন্যাস কেবল মাত্র ভোগের বিষয় নহে। মুখ্যতঃ সুখবিশেষের উৎপত্তি

জন্য উপন্যাস লিখিত হয় না—কোন গ্রন্থই সে জন্ম লিখিত হওয়া উচিত নহে। গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্য—সুতরাং উপন্যাসের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। উপন্যাস মানব-চরিত্রের কাহিনী লইয়া—সুতরাং উপন্যাসের উদ্দেশ্য এই মানবচরিত্রের কাহিনী লইয়া লোকশিক্ষা—এই মানব-জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা লোক-শিক্ষা। উপন্যাস ভোগের বিষয় বটে—কিন্তু তাহার প্রথম ও শেষ কার্য্য এ ভোগ নহে। চিত্তরঞ্জন করিতে করিতে লোকশিক্ষা প্রদানই উপন্যাসের উদ্দেশ্য—চিত্তরঞ্জন করিতে করিতে মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষাপ্রদানই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কোন চরিত্র পূর্ণ, বিকশিত ও স্বাভাবিক হইলেই তাহা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উপযোগী চরিত্র হইতে পারে না। উপন্যাসের উপযোগী শ্রেষ্ঠ চরিত্র এমন হওয়া চাই, যাহাতে মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যাগুলি—যাহা অমীমাংসিত থাকিয়া মানবের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে, তাহা বিবৃত, বিশ্লেষিত ও মীমাংসিত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসের লক্ষ্যভেদে এই দুই প্রকার মত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা চিত্তরঞ্জনই উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা চরিত্রকে পূর্ণ, বিকশিত, স্বাভাবিক করিয়া সহজেই লোকের সুখ জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন। আর যাঁহারা মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা শিক্ষাপ্রদানই উপন্যাসের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সেই সমস্যার ব্যাখ্যায় প্রতিই দৃষ্টি রাখিবেন, তৎসঙ্গে যথাসম্ভব চিত্তরঞ্জনের চেষ্টাও অবশ্য থাকিবে।

এই মতের বিভিন্নতা জন্য আমাদের প্রাচ্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে

বড়ই দলাদলি দেখিতে পাই। অথবা দলাদলিই বা বলি কেন, আমাদের দেশস্থ শিক্ষিত প্রায় লোককেই দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রাতীচ্য মতাবলম্বী হইয়া বঙ্কিম বাবুর শেষের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। ইহা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাঁহারা আমাদের দেশে শিক্ষিত, তাঁহারা ইংরাজী সমালোচনাদি ও কাব্যাদিতে অভিজ্ঞ। প্রাচ্য সমালোচনার গ্রন্থ ত পূর্ব্বে ছিল না—এখনই বা আছে,এমন বলিতে পারিতেছি কই—প্রাচ্য কাব্যাদিতেও এ কথার তেমন আলোচনা নাই। তাই আমাদের দেশস্থ সুশিক্ষিতগণ সেই প্রাতীচ্য মত অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগেরই মতে 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু আমাদিগের মহাকবি চিরকালই বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচকগণের অগ্রে চলিয়াছেন। তিনি উপন্যাসের এই প্রাতীচ্য লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে একটী প্রাচ্য লক্ষ্য দিয়াছেন। এ লক্ষ্য সম্পূর্ণই নূতন।

এই লক্ষ্যদ্বয় বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এই লক্ষ্যদ্বয়ের মূলে অবস্থান করিতেছে। সেই কথাটি খুলিয়া দেখাইতেছি।

এই দেখুন, প্রাতীচ্য জাতি। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের কি উপদেশ, তাহা জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে,ঐহিক সুখই ইঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কেবলমাত্র এ কথা বলিলেও, ইঁহাদের এ ভাবের বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট হইতেছে না—ইঁহাদের বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সচরাচর সকল লোকেই যে সকল কার্য্যে সুখ দেখিয়া থাকে, সেই সকল কার্য্যা-

ষ্ঠানজনিত সুখপ্রাপ্তিই ইঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ হিন্দু-শাস্ত্রে যাহাকে রাজস সুখ বলিয়া থাকে—বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজন্য সেই সুখই ইঁহাদিগের সাধারণের প্রধান লক্ষ্য। প্রাতীচ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর, তাঁহারা এই সুখটীকে ঘসিয়া মাজিয়া, মরালীটি, হিউমানিটি প্রভৃতির ফিল্টারে পরিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন—ব্যবহার করিতে চাহেন। সুতরাং যাহা কিছু পূর্ব্বোক্তরূপে মাজ্জিত সুখজনক তাহাই প্রাতীচ্য নীতিবিজ্ঞানের মতে একমাত্র প্রাপনীয় পদার্থ। এই সুখবুদ্ধি-বশতঃই ইংরাজ বলিতেছেন—গ্রন্থ দুই প্রকার। এক প্রকার শিক্ষাদায়ক—যেমন বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি। আর এক প্রকার সুখদায়ক—যেমন কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদি। সুখ জন্মাইবার ক্ষমতা ও মাত্রা দ্বারাই তাঁহারা কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি সুখদায়ক গ্রন্থের বিচার করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের মতে, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে শিক্ষার সংস্পর্শ থাকা ভাল নহে, কারণ তাহা সুখের বিঘ্নই জন্মাইয়া থাকে। ফলতঃ তাঁহারা মনে করেন, সুখজন্মানই বা চিত্তরঞ্জনই কাব্য-উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা বলেন, "এই লক্ষ্য বজায় রাখিয়া তাহার সঙ্গে শিক্ষা দিতে পার ক্ষতি নাই—কিন্তু সাবধান যেন শিক্ষার মাত্রা বাড়াইয়া বা প্রকৃতি বিসদৃশ করিয়া এই সুখের হানি জন্মাইও না। তাহা হইলে, কাব্যের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে—যই ভাল হইবে না।"

কিন্তু এ দিকে দেখ, প্রাচ্য জাতি। এই জাতির সুখের ও কর্ত্তব্যের ধারণাই মূলগত কত বিভিন্ন। হিন্দু মনে করেন, দুঃখ-সম্ভাবনা-বর্জ্জিত চিরকাল সেব্য সুখ বা আনন্দই মানব জীবনের

প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা বলেন, এই সুখ বা আনন্দলাভার্থে মানব-জীবনের প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। এ আনন্দ—এ বিমল সুখ সহজে ও প্রথমেই কেহ লাভ করিতে পারে না; অথচ মানবমাত্রই চিরসুখাভিলাষী। তাই হিন্দুর ব্যবস্থা, ইংরাজ যাহাকে সুখ বলেন, সেই সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত যে সাত্ত্বিক সুখ বা সুখদুঃখভাবরহিত আনন্দ, তাহাই পাইবার জন্য মানবকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান—ইহাই হিন্দুর শাস্ত্রোপদেশ। অমার্জ্জিত সুখ ত্যাগ কর—মার্জ্জিত সুখও ভোগ করিতে করিতে ত্যাগের চেষ্টা কর—সুখদুঃখরহিত যে আনন্দ তাহাই পাইতে যত্নবান হও, ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মের কথা। এই শেষোক্ত সুখ যিনি উপভোগ করিতে-ছেন, হিন্দু তাঁহাকেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলেন এবং হিন্দু ইহাও বলেন যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইলেই এই সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এ কথা ভাল করিয়া বলিতে গেলে, অনেক বলিতে হয়। তাই আমরা সংক্ষেপে ইহাই বলিতে চাহি যে, এই শ্রেণীর লোকের সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্যই সেই এক ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহাদের মতে, এমন কোন কার্য্যই অনুষ্ঠেয় নহে, যাহা এই ধর্ম্মের, এই আনন্দলাভের বিরোধী। তাই হিন্দুর আহার, বিহার, প্রভৃতি সকল কার্য্যই সেই একাভিমুখী। আহার—বিহারেও যাহাদিগের মূল লক্ষ্য ধর্ম্ম—গ্রন্থ লিখিতেও তাঁহাদিগের মূল লক্ষ্য ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আবার ধর্ম্মার্থ গ্রন্থ লিখিতে হইলে তাহা লোকশিক্ষার্থ ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থ লেখা হয়, অন্যের পাঠের জন্য। এই লেখা তখনই ধর্ম্ম হয়, যখন অন্যে তাহা পড়িয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয় বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের

আবশ্যকতা উপলব্ধি করে। সুতরাং হিন্দুর মতে লোকশিক্ষা ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের অন্য প্রকার উদ্দেশ্যই হইতে পারে না।

এই মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না।

প্রাচ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রাতীচ্য মতটীকে একটু প্রাচ্য ছাঁচে ঢালিয়া উপন্যাস-সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা চিত্তরঞ্জনই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এই সৌন্দর্য্য উপভোগেই মানব-মন বিশোধিত হইতে পারে। উপন্যাস লেখা পাঠকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশের জন্যই বটে—তাহাই ইহার প্রধান লক্ষ্যও বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সৌন্দর্য্য আলোচনাতেই বিকশিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

এই মতটি প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য মতের সম্মিলন বলিয়া প্রথমে ভ্রান্তি হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ মতটি সম্পূর্ণই প্রাতীচ্য। প্রাচ্য যুক্তি বলে প্রাতীচ্য মত সমর্থনের চেষ্টাতেই এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা জানি, বাঙ্গালার কোন সুবিখ্যাত লেখক এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা এই মত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বেশী লিখিবার সাধ থাকিলেই বা তাহা পারিতেছি কই?

এই মতাবলম্বী সমালোচক পাঠকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশ জন্য সৌন্দর্য্যের আলোচনাই উপন্যাসের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। যদি সৌন্দর্য্যের আলোচনায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বস্তুতঃই বিকশিত হয়, তবে আমাদিগের প্রাচ্য কবিও অবশ্য ইহাকে উপন্যাসের বিষয় মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রাতীচ্যগণ যে সকল ভাবকে

সৌন্দর্য্য বলেন, তাঁহার প্রত্যেক প্রকারের সৌন্দর্য্যের আলোচনায় যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কোন প্রকারে বিশেষ বিকশিত হয়, তাহা সকলে স্বীকার করিবেন কি ?

(২) যদি সৌন্দর্য্যের আলোচনাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকশিত হইবার সম্ভাবনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি উপন্যাসের একটী লক্ষ্য বলিয়াই ধরিতে পারি। কারণ উপন্যাস দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশের অন্য উপায়ও আছে। যেমন, মানব-জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা। ইহাকে উপন্যাসের বিষয় বলিতে কুণ্ঠিত হই কেন ?

তবে যদি ইঁহারা বলেন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশ উপন্যাসের লক্ষ্য বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য চিত্তরঞ্জন ; তবে সহজেই তাঁহাদিগকে প্রাতীচ্য মতাবলম্বিগণের সহিত মিশাইয়া রাখিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারি।

বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাস।

এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা উভয় স্তরের উপন্যাসেরই লক্ষ্য। তবে দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে সে সমস্যা যত স্থূল, যত সাধারণ—তৃতীয় স্তরের সমস্যা সেরূপ নহে। ধর্ম্মপথে যাঁহারা একটু অগ্রসর, তৃতীয় স্তরের উপন্যাস

তাঁহাদিগেরই উপযোগী। এখনও এই স্তরের উপন্যাস বঙ্গীয় পাঠকের উপযোগী হয় নাই—মহাকবি চিরদিনই পাঠকের বহু অগ্রে চলিয়া থাকেন।

যদি প্রাতীচ্য মতানুযায়ী চিত্তরঞ্জন ক্ষমতা দ্বারাই উপন্যাসের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলেও এই দুই স্তরের উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠাসন দিতে আপত্তি করা যায় না। দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে লক্ষ্য থাকিলেও, প্রাতীচ্যমতাবলম্বী সমালোচকগণও এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই আবার বলিয়া থাকেন, উপন্যাসের চিত্তরঞ্জন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকিলে ভাল কাব্যকৌশল প্রকাশিত হইতে পারে না। উপন্যাসের উদ্দেশ্য থাকিলেও যে তাহাতে কাব্যকৌশল থাকিতে পারে, বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসগুলিই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। ইহাতে যে art বা কাব্যকৌশল সুপ্রকাশিত আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন—আর উহার উদ্দেশ্য যে মানবজীবনের সমস্যা-ব্যাখ্যা তাহাও সকলেই স্বীকার করিতে পারেন।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য থাকিলেই যে তাহা কাব্যকৌশলবিরহিত হইবে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। তবে এ কথা বলা যায় যে, উপন্যাসে যে পরিমাণে উদ্দেশ্য থাকিবে, তাহাতে কাব্যকৌশল প্রদর্শন করিতে সেই পরিমাণে কষ্ট হইবে। সাধারণ পাঠক-সমীপে দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে art প্রকাশ করা যতটা সহজ, তৃতীয় স্তরের উপন্যাসে art দেখান ততটা সহজ নহে। ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য।

(১) দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস অপেক্ষা তৃতীয় স্তরের

উপন্যাসের বিষয় উচ্চ,—উচ্চ বিষয়ে Art প্রকাশ করা নীচ বিষয়ে প্রকাশ করা অপেক্ষা কষ্টকর। যেমন একটা সরল রেখা অঙ্কনকারী যেমন সহজে সরল রেখাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহাতে বাহাদুরী নিতে পারে, একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনকারী তত সহজে সে বাহাদুরী নিতে পারে না। হয় ত যে সরল রেখা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিল, সে প্রতিমূর্ত্তি আদৌ অঙ্কিতই করিতে পারিবে না। তুলনায় Art বিচারে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেই হইবে।

(২) দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয় প্রেমসমস্যা। এই প্রেম বা কাম, বা প্রেম-কাম বা এমনই একটা কিছু, সকলের হৃদয়েই স্বতঃ খেলিয়া থাকে। সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতেই এ সুর বাজিয়া থাকে। সুতরাং লেখক অতি সামান্য চেষ্টাতেই এই হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারেন, এবং এইটী স্পর্শমাত্র স্বতঃ-নিনাদিত ধ্বনিতে তিনি সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারেন। পুরুষ ও স্ত্রীর যে সম্বন্ধ লইয়া এই সকল সমস্যা বিবৃত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধ পাঠককে বুঝাইতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। যাঁহারা সেই সম্বন্ধ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের উপন্যাসে তাঁহাদিগের চিত্ত প্রতিফলিত দেখিয়া আনন্দলাভ করেন এবং তজ্জন্য গ্রন্থকারের Art প্রশংসা করেন—আর যাঁহারা সে সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের হৃদয় জ্ঞান দেখিয়া সহজেই তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন ও তাঁহার (Art) প্রশংসা করেন। ফলতঃ এ গুণ (Subject) বিষয়েরই বেশী। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয় এমনই কঠিন যে, তাহা সকল পাঠকের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে গ্রন্থকার সমর্থ হয়েন না। সুতরাং পাঠক

গ্রন্থকারের (Art) শিল্পের প্রশংসা প্ররিতে পারেন না। যাঁহাদিগের হৃদয়ে এ সুর প্রবেশ করিতে পারে, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ হৃদয়-যন্ত্রের সুরের সহিত ইহা মিলাইতে না পারিয়া —গ্রন্থকারের (Art) শিল্পের প্রশংসা করেন না। যেমন উচ্চ বিষয়, তেমনই উচ্চ শ্রেণীর পাঠক চাই—নতুবা গ্রন্থের (Art) শিল্প অন্য বুঝিবে কেন? অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য স্থূলবুদ্ধি লোকের নিকটে প্রকাশিত হয় না—কারণ তাহারা সে (Art) বুঝিতে পারে না।

আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাসে বঙ্কিম বাবুর (Art) খুব খেলিয়াছে; পাঠকবর্গ বোকা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, সাধারণ পাঠক এ (Art) সম্বন্ধে সুবিচারক নহে। কারণ Art ভাল খেলিয়া থাকিলেও সাধারণ পাঠকের তাহা না বুঝিবারই সম্ভাবনা বেশী। আর তৃতীয় স্তরের উপন্যাসে গ্রন্থকারের Artও তেমন না খুলিতে পারে, কারণ বিষয় বড় উচ্চ; ইহাতে Art প্রকাশ করা কঠিন। পাঠকবর্গ একবার এই সকল কথা ভাবিয়া মহাকবির এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাসগুলির দোষ-গুণ পর্য্যালোচনা করিবেন।*

* আমরা এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাস পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলাম 'আপনার এই শেষ উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে প্রথমের উপন্যাসগুলি বড়ই তরল-প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়" এই কথার উত্তরে গ্রন্থকার আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"এ সম্বন্ধে তোমার যে মত, অনেকেরই সেই মত।"

দৃষ্টিমূলক (Real) ও কল্পনামূলক (Ideal) উপন্যাস।

কোন একটী দিগন্তবিস্তৃত দৃশ্য দেখাইয়া দুইটি চিত্রকরকে বলা হইল, "তোমরা ইহা দেখিয়া দুইটি চিত্র প্রস্তুত কর।" চিত্রকর দুইটি, দুইটি চিত্র প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের সম্মুখে ধরিল।

প্রথম চিত্রকর যে পটখানি অঙ্কিত করিল, তাহা সেই বিশাল দৃশ্যস্থিত স্থান-বিশেষের অবিকল প্রতিকৃতি হইল, বা তাহাতে সেই বিশাল দৃশ্যস্থিত কতকগুলি সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ চিত্রিত হইল। সে ঠিক সেই তেমনই মানুষ, তেমনই পর্ব্বত, তেমনই বৃক্ষ, তেমই লতা আঁকিল—ঠিক সেই তেমনই সাগর, তেমনই ঊর্ম্মি, তেমনই কানন, তেমনই প্রান্তর আঁকিল। এক চুলও এধার ওধার করিল না। যাহা সে দেখিতে পাইল, তাহা সে ঠিক্ তেমনই করিয়া আঁকিল। সে চিত্র দেখিয়া আপনারা মুগ্ধ হইলেন—কিন্তু তাঁহাতে এই বিশাল দৃশ্যস্থিত সৌন্দর্য্য ব্যতীত অপর কোন সৌন্দর্য্য অপনারা দেখিতে পাইলেন না, বা আনন্দ ভিন্ন আপনাদিগের আর কিছুই লাভ হইল না।

দ্বিতীয় চিত্রকর যখন তাহার চিত্রপটখানি প্রদর্শন করিল, আপনারা দেখিলেন, সে চিত্রপট খানির অবিকল সাদৃশ্য আপনার সেই বিশাল দৃশ্যের কোথাও নাই। চিত্রকর এ স্থানের একটা গাছ, ওখানের প্রান্তরে রোপণ করিয়াছে, ওখানের

একটা নদী এখানে বহাইয়া দিয়াছে। অথচ এমনই সে চিত্র-পটের সৌন্দর্য্য হইয়াছে যে, প্রকৃত দৃশ্যেও অপনার সে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নাই। চিত্রকর যেখানে যাহা দেখিয়াছে, সেখানে অবশ্য যাহা যেরূপ ছিল, তাহাই মূলে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে যাহা করিয়াছে তাহা দৃশ্যমধ্যস্থ কোন পদার্থেরই তুল্য নহে। সে এক অপূর্ব্ব চিত্র! কেবল মাত্র দেখিতে সেই চিত্র অপূর্ব্ব হইল এমন নহে, তাহা এমন হইল যে তাহা দেখিয়া প্রকৃত দৃশ্যস্থিত কোন্ সৌন্দর্য্যের কি কলঙ্ক আছে, তাহা আপনারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন—কোন্ গাছটিকে কিরূপ যত্ন করিলে আপনি তাহার সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাধিক শত গুণে বাড়াইতে পারেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়া কিরূপে তাহাকে নষ্ট করে—নদীতে কুম্ভীর কোথায় থাকে, রত্নই বা কোথায় থাকে—এ সকল অনায়াসে অপনারা বুঝিতে পারিলেন।

এখন বলুন দেখি পাঠক, আপনারা কোন্ চিত্রকরের প্রশংসা করিবেন—কোন্ চিত্রের প্রশংসা করিবেন?

এই প্রথম চিত্রকর ও দ্বিতীয় চিত্রকরে যে প্রভেদ—Real ও Ideal উপন্যাসকারেও সেই প্রভেদ। এই দুই চিত্রে যে প্রভেদ Real ও Ideal উপন্যাসেও সেই প্রভেদ।

জগতের অসংখ্য নরনারীচরিত্র উভয় প্রকারের উপন্যাসেরই বিষয়। এক উপন্যাসকার সেই নরনারীচরিত্র হইতে কয়েকটি বাছিয়া ঠিক তাহারই প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার উপন্যাসে চিত্র করেন। অপর উপন্যাসকার সেই নরনারীচরিত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েক প্রকার নরনারীচরিত্র মূলতঃ অবলম্বন করিয়া, মানবজীবনের কঠিন২ সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা

লোকশিক্ষার্থ সেইগুলি তাঁহার উপন্যাসে চিত্র করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

আমরা আর বলিব না—ইহাদের মধ্যে কে অধিকতর শিল্পী—কে অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র—কোন্ চিত্র সুন্দর, কোন্ চিত্র উন্নতি-বিধায়ক? সে বিচার আপনারাই করিয়া লইবেন। আমরা অতি সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বলিলাম।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের অস্বাভাবিকতা।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের চরিত্র অস্বাভাবিক এই কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাই। ইঁহাদিগের দুই এক জনের নিকটে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে 'অস্বাভাবিক' কথাটা তাঁহারা "অসামাজিক' অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ বোধ হয়। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

কেহ কেহ বলেন সূর্য্যমুখী হিন্দুঘরের স্ত্রীলোক, তাঁহার কি ঐরূপে একাকী ঘরের বাহির হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক হইয়াছে?

পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন, আমরা যাহাকে অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক বলি, ইহাতে তাহার কিছু দেখা যাইতেছে না; তবে ইহাকে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য বা অসামাজিক কার্য্য বলা যায় বটে।

কেহ কেহ বলেন—শান্তি প্রফুল্লের অন্য পুরুষের সঙ্গে ঐরূপ কথোপকথন অস্বাভাবিক। এখানেও পাঠকগণ দেখিবেন, ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বাভাবিক নহে। হিন্দুরমণী সচরাচর এরূপ করিয়া থাকে না বটে—কিন্তু রমণীতে যে এরূপ করিতে পারে তাহা সকলেই দেখিতেছেন—অতএব এ দোষটাও অস্বাভাবিকতা নহে—অসামাজিকতা।

এই ঠিক সমাজের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করা কবির অভিপ্রেত ছিল না; তিনি তাহা বিশেষ আবশ্যকও জ্ঞান করেন নাই। তিনি যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপন্যাস লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সমাজ বিশেষের উপকার নহে। সকল জাতির—সমস্ত লোকের যাহাতে উপকার হইতে পারে,তাহাই তিনি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে যদি সমাজ-বিশেষের কোন চরিত্র,সমাজ-বিরোধী কোন কার্য্য করিয়া থাকে, সে দোষ পাঠকগণের ধরা উচিত নহে। হাঁ, যদি এই দোষ-জন্য তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে কোন বিঘ্ন হইয়া থাকে, তবে অবশ্য এ দোষ উপেক্ষার বিষয় নহে। নতুবা এ দোষ চন্দ্রের কলঙ্ক স্বরূপ। অনেকস্থলেই শোভারই বৃদ্ধি করিয়াছে।

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার দ্বারা গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছেন, তাহার কণা-মাত্রও বিফল হয় নাই। এ সকল সামান্য ব্যাপার মাত্র, মূলে ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা পাঠকবর্গকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। একদিন বঙ্গের কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি কথোপকথন-প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলেন, "আচ্ছা মহাশয়,আপনারা

শান্তিকে প্রশংসা করিতেছেন, শান্তির ন্যায় আপনাদিগের স্ত্রী যদি ঐরূপ বনে জঙ্গলে বাহির হইয়া ঐরূপ পুরুষের সহিত মিশে আপনারা তাহাকে পছন্দ করেন?" আমরা এ কথার উত্তরে বলিয়াছিলাম—"যদি আমাদিগের সহধর্ম্মিণীর অন্য সকল গুণ শান্তির মত হয়, তবে সে শান্তির চেয়ে আরো বেশী পুরুষের সঙ্গে মিলিলেও আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া আপনাকে পুণ্যবান্ মনে করি।"/

ফল কথাও এই যে, সকল জড়াইয়া দেখিলে, এ সকল সামান্য ব্যাপারের উল্লেখই অকর্ত্তব্য। গ্রন্থকার অবশ্য আবশ্যক বোধ করিলে এ সকল দোষ সহজেই দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন স্থলে তিনি ইহার দোষ উপেক্ষাই করিয়া গিয়াছেন—কোন কোন স্থলে এই আপাতদৃষ্ট দোষ স্বীকার করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শৈবলিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার ফষ্টরের সঙ্গে যাওয়াতে যতটা খুলিয়াছে, সহজে অন্য ব্যাপারে ততটা খুলিত না।

/যাহা অস্বাভাবিক তাহার নিন্দা কর, কিন্তু যাহা সমাজ-বিশেষের বিরোধী, তাহার নিন্দা করিবে কেন? কবি ত সমাজের ফটো তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কলম ধরেন নাই—তাহা যাঁহারা ধরিয়াছেন, সেই Real উপন্যাস লেখকগণের উপন্যাসে এ সকল দোষ-গুণ আলোচনা কর। তিনি যে উদ্দেশ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য ধরিয়া তাঁহার সেই কার্য্য বিচার করাই নিরপেক্ষ সমালোচকের কার্য্য। কোন সমাজের চিত্র সেই সমাজবিরোধী বেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া কি, সেই চিত্র কম ফলদায়ক Impressive হইয়াছে? যেখানে সেই

রূপ দেখিতে পাইবে সেখানে তাঁহার Art নিন্দা করিও, কিন্তু Real উপন্যাসের স্বাভাবিকতার বা সামাজিকতার সঙ্গে তাঁহার উপন্যাসের স্বাভাবিকতা ও সামাজিকতা তুলনা করিয়া তাঁহার উপন্যাসের সমালোচনা করিও না। Real উপন্যাস-লেখক সামান্য চিত্রকর মাত্র—আমাদের মহাকবি আমাদিগের গুরু স্বরূপ। তিনি চিত্র দেখাইয়া ছেলে ভুলাইতে চাহেন নাই—তিনি চিত্র প্রদর্শনে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র।

তিলোত্তমা, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, রজনী, দলনী ও রমা—অল্পাধিক চরিত্রের মৃদুতাই ইঁহাদিগের বিশেষ বিশেষত্ব। এই চরিত্রের মৃদুতার সহিত কমনীয় প্রেমবৃত্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণেই ইঁহারা গঠিত হইয়াছেন। ঠিক "চাঁদের আঁচলে নবনীত ছাকিয়া"ই যেন কবি ইঁহাদিগকে গঠন করিয়াছেন। এই সকল চরিত্রের অপর একটী বিশেষত্ব সংসারানভিজ্ঞতা। তিলোত্তমা হইতে রমা পর্য্যন্ত সকলেই সংসার-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলার ত কথাই নাই। বোধ হয় ইহাও চরিত্রের মৃদুতা হইতে উৎপন্ন। এই অল্পভাষিণী—কুসুম-কমনীয়া—সংসারশাস্ত্রে অনভিজ্ঞা রমণীগণ বঙ্কিম বাবুর প্রথম স্তরের স্ত্রীচরিত্র।

এই কয়েকটি চরিত্রের একভাবে বিপরীত চরিত্র—বিমলা ও কমলমণি। যেমন তিলোত্তমাদিতে চরিত্রের মৃদুতা, বাক্য-বিহীনতা, সংসারশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা দেখিতে পাই, এই দুইটি চরিত্রে তেমনই চরিত্রের প্রখরতা, বাক্যের প্রগল্‌ভতা ও সংসার-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দেখিতে পাই। ফলতঃ নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, এই দ্বিবিধ চরিত্র প্রতিই আমাদিগের দৃষ্টি পতিত হয়। আমরা ভালবাসিবার জন্য, সমান আসন প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন জন্য, বিমলা ও কমলমণিকে চাহি—কিন্তু স্নেহ করিবার জন্য, কল্পনাময়ী প্রবৃত্তির সহচারিণী করিবার জন্য তিলোত্তমাদি রমণীই পছন্দ করিয়া থাকি। এই দুই শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রোপরি যুবক কবির দৃষ্টি সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

তিলোত্তমাদি হইতে বিমলা ও কমলমণি আর দুই একটি বিষয়েও বড় বিভিন্ন। তিলোত্তমাদির প্রেম যেমন বন্যার নদী-জলের মত উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত, এই বিমলা ও কমলমণির প্রেম তেমন উদ্বেলিত নহে, কিন্তু তবু পরিপূর্ণ। একে আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি আছে—অন্যে ভোগের তৃপ্তি আছে। আবার তিলোত্তমাদি যেমন আপনা লইয়াই ব্যস্ত—আপনার প্রেম-সাগরেই আপনি মগ্ন, বিমলা ও কমলমণি তেমন নহে। তাঁহারা ঠিক ইহার বিপরীত। বিমলা ও কমলমণি পরের জন্যই বেশী ফুটিয়াছেন। এ কথা অন্যত্র বিস্তৃত বলিয়াছি।

গ্রন্থকার তিলোত্তমাদি চরিত্রে প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন, এবং তাহার স্থির, ধীর তৃপ্তিও দেখাইয়াছেন। বিমলাদি চরিত্রেও প্রণয়ের ধীর, স্থির অথচ পরিপূর্ণ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার প্রণয় সম্বন্ধীয় সকল দিক দেখান হইল না। তাই

আয়েসা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। ইনি নিরাশ-প্রণয়ী। তিলোত্তমাদি সকলেই যেমন ভালবাসিয়াছেন, তেমনই ভালবাসা পাইয়াছেন, এই আয়েসা তাহার বিপরীত চিত্র। ইনি যেমন ভালবাসিয়াছেন, তেমন ভালবাসা পাইতে পারেন নাই। প্রণয়ের এই দিক্‌টা দেখাইবার জন্য আয়েসার সৃষ্টি হইল।.

কিন্তু আয়েসা-সৃষ্টি করিয়াও কবি প্রণয়ের এ ভাগটা শেষ করিতে পারিলেন না। আয়েসা জগৎসিংহকে ভালবাসিতেন, জগৎ সিংহ আয়েসাকে তেমন ভালবাসিতেন না—জগৎ সিংহ তিলোত্তমাতে অনুরক্ত, তাহাকেই বিবাহ করিলেন—এ অবস্থায় রমণীর চিত্র যেমন হইতে পারে, আয়েসা তেমনই হইল। কিন্তু নিরাশ প্রণয়ের আর একটা ভাব দেখাইতে বাকী রহিল। যে ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকা পরস্পর অনুরক্ত, অথচ ঘটনা-বিশেষে ব. সামাজিক নিয়মবশে তাহাদের সে প্রণয়ের পরিতৃপ্তি (মিলন-কেই পরিতৃপ্তি বলিলাম) হইতে পারে না, সে স্থলে কিরূপ হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য শৈবলিনী ও লবঙ্গলতা কল্পিত হইল। দুইয়েরই মনের অবস্থা প্রায় তুল্য, তবে একে প্রণয়ের উচ্ছ্বাস সংবরণ কবিতে না পারিয়া, প্রণয়ীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল—অপরে প্রেমোচ্ছ্বাস শিক্ষাবলে সংযত করিয়া তাহাকে বিন্দু হইতেও বিন্দুতে পরিণত করিয়া সভয়ে হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে এক কোণে রাখিয়া দিল। উভয়েরই অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া কবি দেখাইয়াছেন; একে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে—অপরে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে উজ্জ্বলতর হইয়া, চতুর্দ্দিকে দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছে।(7)

আবার এই আয়েসা ও লবঙ্গলতার মধ্যবর্ত্তী চরিত্র (যে ভাবের সম্বন্ধে বলিতেছি অবশ্য সেই ভাবে) এই মনোরমা। মনোরমা আয়েসাও নহে, শৈবলিনী বা লবঙ্গলতাও নহে। অথচ তাহার প্রণয় ইহাদিগেরই ন্যায় লুকায়িত। যেমন তিলোত্তমাদির মধ্যে কপালকুণ্ডলার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, যেমনি এই গুপ্তপ্রণয়িনী-শ্রেণী মধ্যে মনোরমাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। এ কথা অন্যত্র খুলিয়া বলিয়াছি, এখন এই সম্বন্ধ মাত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

এই সকল দেখিতে দেখিতে প্রণয়ের আরও একটা ভাবের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়িল। সে ভাবটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকেই দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু কবি তাহাও দেখাইয়াছেন, পদ্মাবতী ও আরঙ্গজেবের-কন্যা এই চরিত্রদ্বয়ে। ইহারা বড় ঘরের হইয়াও বারাঙ্গনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই বারাঙ্গনার প্রণয়-বিবৃতিই এই চরিত্রদ্বয়ের এক প্রকার লক্ষ্য। বৃত্তি যাহাই থাকুক, এই শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রেও প্রণয় পাত্রবিশেষে কিরূপে প্রবেশ করে, কিরূপে আধিপত্য করে, এই দুইটি স্ত্রীচরিত্র তাহাই দেখাইয়াছে। তিলোত্তমাদির পরে যেমন আয়েসার কল্পনা, আয়েসার কল্পনার পরে যেমন মনোরমার কল্পনা, মনোরমার কল্পনার পরে যেমন লবঙ্গলতা ও শৈবলিনীর কল্পনা, তেমনই শৈবলিনীর কল্পনার পরে এই পদ্মাবতী প্রভৃতির কল্পনা স্বাভাবিক। ফলতঃ প্রণয়ের কোন অংশই গ্রন্থকার দেখাইতে বাকী রাখেন নাই।

এই সকল চরিত্রই আমরা গ্রন্থকারের প্রথম স্তরের স্ত্রীচরিত্র বলিব। পাঠকগণ মনে রাখিবেন, প্রথম স্তরের স্ত্রীচরিত্রে

প্রথম স্তরের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রে প্রভেদ থাকিতে পারে। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই সকল স্ত্রীচরিত্রের পরে আর এক স্তরের স্ত্রীচরিত্র গঠিত হইল। এই স্তরের স্ত্রীচরিত্রে প্রণয়ের সেই বিস্তৃত রহস্য বিবৃত হইল।

সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, এই দুইটি চরিত্রই এই স্তরের প্রধান চরিত্র।

স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-রহস্য এই চিত্র দুইটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রধানতঃ স্বামী ব্যাভিচাররত হইলে, স্ত্রীর কোন্ প্রকার ব্যবহারে কোন্ ফল হইয়া থাকে, তাহাই এই চরিত্রদ্বয় পাঠে অবগত হইলাম। তাহাই শিক্ষা দেওয়া এই চরিত্রদ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে।

আর একদিক হইতেও দেখুন, আর একটা সম্বন্ধ বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা নায়ক-নায়িকার বিঘ্নবহুল অথচ মিলনযুক্ত প্রণয়ের উচ্ছ্বাসের ভাব ও স্থিরভাব দেখিয়াছি, পূর্ব্বে আমরা নায়কনায়িকার মিলনাবস্থায় স্থির ভাব ও ধীর প্রেমস্রোতও দেখিয়াছি; পূর্ব্বে আমরা নায়ক নায়িকার মিলনাশারহিত, উচ্ছ্বসিত শুধু প্রণয়ের ভাবও দেখিয়াছি—এখন বাকী আছে, আর একটি ভাব দেখিতে। এ পর্য্যন্ত যে প্রণয় দেখিয়াছি, তাহা প্রায় এক টানা—এই প্রণয়ের স্রোত এই সকল চরিত্রে এক দিকেই প্রায় বহিয়াছে। কিন্তু প্রণয়ের স্রোত ফিরিলে, প্রণয়-সাগরে জোয়ার ভাঁটা খেলিলে কিরূপ হয়, তাহা আমরা দেখি নাই। কবি তাহাই দেখাইবার জন্য আর এক শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিলেন; তাঁহাদের নায়কের প্রণয়ে এই জোয়ার ভাঁটা

খেলিয়াছে। নায়িকার প্রণয়ে জোয়ার ভাঁটা দেখাইতে গে
তাহা বেশ্যার চিত্র হইয়া পড়ে, সে বেশ্যার চিত্রও পদ্মা
প্রভৃতিতে দেখিয়াছি। এখন নায়কের প্রণয়ের স্রোত ফিরি
কিরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা দেখিতে পাইলাম। এ হিসাবেও ?
মুখী ও ভ্রমর পূর্ব্বোক্ত চরিত্রগুলি হইতে পৃথক স্তরের বটে।

নন্দা কলঙ্কশূন্যা সূর্য্যমুখী; সাগর ক্রুদৃষ্টিবির্জ্জা
ভ্রমর।

এখন তৃতীয় স্তরের স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগের বক্ত
বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভগবানের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে জীবগণের পুং স্ত্রীবিভাগ ?
অদ্ভুত রহস্য। ভাবিয়া দেখিলে এই অপূর্ব্ব রহস্য-মধ্যেই ?
জীবসৃষ্টিরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। জীব সৃষ্টির মধ্যে আ
মানব-সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যময়। সেই মানব ?
মধ্যে রমণী-পুরুষের সম্বন্ধ বুঝি জগতের রহস্যের মূ
রহস্য। মানবরাজ্যটিই যেন এই অপূর্ব্ব রহস্যে কেন্দ্র,
ঐ যে দিগন্তব্যাপী সংসারচক্র মহান্ কোলাহল র
দিবানিশি অবিশ্রান্ত বিঘূর্ণিত হইতেছে—স্ত্রীপুরুষের ?
ইহার প্রধান কারণ। যে বিবাহ হইতে এই সংসার
বিবাহই এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের একটি অপূর্ব্ব সংযো?
তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ স্ত্রীপুরুষের এইরূপ নৈসর্গিক প?
দৃষ্টি করিয়া, ইহা হইতে ভগবানের অভিপ্রেত শুভ
মানসে, বিবাহ-প্রথার প্রচলন করিলেন। ক্রমে
এই শুভ প্রথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সম?
ইহার শুভফল ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত ?

র্জিত করিলেন, স্বাভাবিক রহস্য সামাজিক রহস্যে পরিবৃত ইয়া আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইল।

বিবাহ সম্বন্ধে স্থূলতঃ সকল জাতিই একমত হইল বটে, কিন্তু ী-পুরুষের সম্বন্ধ-বিচারে—পরস্পর কর্ত্তব্যবিচারে ইহার হিক পারত্রিক ফল বিচারে, জাতিগত বিষম বৈষম্যের সৃষ্টি ইল। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জীবনের কর্ত্তব্য র্দ্ধারণে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মতই এই বৈষম্যের মূল কারণ। াহারা মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সামান্য ইন্দ্রিয়াদি সুখ লাভের ষ্টাতেই পর্য্যাপ্ত করিলেন—স্ত্রী তাঁহাদিগের নিকট হইল ইন্দ্রিয়- গের উপকরণ, বিলাসের সামগ্রী। তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ হিক সুখকর বলিয়া ঐহিক হইয়াই পড়িল। তাঁহারা যত্ন রিয়া তাঁহাদের রমণীবৃন্দকে এই ঐহিক সুখবর্দ্ধনের ক্ষমতা রবৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা মানবের কৃত সুখ লাভের অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত সুখলাভের চেষ্টায় ধর্ম্মাচরণই নর কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন—স্ত্রী হইল তাঁহাদের ট সহধর্ম্মিণী। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীকে স্বামীর ধর্ম্মচর্য্যায় তা করিতেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ বিভিন্ন তে বিভিন্ন প্রকার স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত ড়িল।

বাহুল্য যে, হিন্দুজাতি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবেই গ্রহণ হিন্দুপত্নীর সহিত হিন্দুপতির সম্বন্ধ ঐহিক হইতে ইল। হিন্দুরা হিন্দুপত্নীকে স্বামীর ধর্ম্মে সহায়তা দিতে লাগিলেন। ফলে এই হইল যে, হিন্দু- ঐহিক, পারত্রিক, সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ

সুখেরই উপাদান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির যেমন প্রণয়িনী সুখপ্রদায়িনী,—তেমনই আবার সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মশক্তি-বিধায়িনী। অন্য জাতির পত্নী কি এরূপ নহে? তাহা নহে। মানব ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যাহাই নির্দ্দিষ্ট করুক না কেন—ভগবানের অভিপ্রেত নৈসর্গিক সম্বন্ধ কোথায় যাইবে? হিন্দুজাতির ন্যায় অন্যান্য জাতিরও ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সংসারে সন্ন্যাসে স্ত্রী পুরুষের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ অতি অদ্ভুত ক্ষমতাই প্রকাশ করে। তবে প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া স্ত্রীগণের শিক্ষাপ্রণালাটি অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন—অন্য জাতি ইহা না বুঝিয়া তাহাদের রমণীবৃন্দেব শিক্ষাপ্রণালী কিছু বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু পতি-পত্নীর ধর্ম্মই মূল লক্ষ্য —প্রণয়, সুখ, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; অন্য জাতির স্বামী-স্ত্রীর-প্রণয়-সুখই মূল লক্ষ্য, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মটা যতটুকু আসিয়া পড়ে। অপক্ষপাত চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে—মূলতঃ অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, ফলতঃ হিন্দুরাই কিছু ভাল বুঝিয়াছেন।

হিন্দুগণের স্ত্রী-পুরুষের এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধই হিন্দুকবি বঙ্কিম-চন্দ্রের কাব্যের একটি প্রধান বিষয়। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীচরিত্র-গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, হিন্দু-পতি পত্নীর সম্বন্ধটা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়।

হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির যেরূপ আনন্দদায়িনী প্রণয়িনী, সেই-রূপই আবার কর্ম্মশক্তিবিধায়িনী সহধর্ম্মিণী। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে হিন্দুপত্নীর এই দ্বিবিধ ভাবই সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ এই ভাব অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র স্ত্রীচরিত্র দ্বারাও তাঁহার উপন্যাসের স্তরবিভাগ প্রদর্শন করা যায়। তাঁহার প্রথম দুই

স্তরের উপন্যাসে স্ত্রীর প্রণয়িনী-ভাবই মুখ্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর এইরূপ প্রণয় কেমন সুন্দর, কেমন সুখদ, তাহা তিনি প্রথমে দেখাইয়া, সেই প্রণয়ের নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিরূপে সামান্য কথায়—সামান্য আত্ম-সংযমের অভাবে—সামান্য সতর্কতা অভাবে,সে প্রণয়-সুখ ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা তিনি প্রথম দুই স্তরের উপন্যাসে অতি জলন্ত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা মানবমনের প্রণয়বৃত্তির রহস্যটি অতি সুন্দর রূপেই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষের স্তরের উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্রের মুখ্যভাব প্রণয়িনীভাব নহে—সহধর্ম্মিণী ভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই শেষের ভাবের সঙ্গে প্রথম ভাব অবশ্যই জড়িত থাকিবে। তাই আনন্দমঠ—দেবীচৌধুরাণী—সীতারাম—এই উপন্যাসত্রয়ের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি যেরূপ প্রণয়িনী সেইরূপই সহধর্ম্মিণী। এই উপন্যাসত্রয়ের স্থূল বিষয়ও যেরূপ উচ্চ, স্ত্রীচরিত্রের ভাবগুলিও তেমনি উচ্চ। এই স্তরের উপন্যাসে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—হিন্দুপত্নী কিরূপে হিন্দুপতির ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে পারে, কিরূপে সেই সহায়তা প্রাপ্ত হইলে হিন্দুপতি বিবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও স্বায় ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ও বজায় রাখিতে পারে। আবার ইহাতেই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর সাহায্য অভাবে লোকে কিরূপে ধর্ম্ম-পথস্খলিত ও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যায়—কিরূপে জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী ব্যক্তিরও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ—প্রকৃত সহধর্ম্মিণী অভাবে—সামান্য কামজ প্রেমে পরিণত হইয়া যায়। তাঁহার এই শেষের স্তরের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রের পাপগুলি অতি সূক্ষ্ম; সামান্য বুদ্ধিতে তাহা ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু তবু সেই সকল সূক্ষ্ম

পাপে কিরূপ স্থূল পতন আনয়ন করিতে পারে তাহা তিনি এই শেষের স্তরের উপন্যাসগুলিতে অতি সুন্দরই দেখাইয়া গিয়াছেন।

শান্তি, শ্রী, প্রফুল্ল, নিশা ও জয়ন্তী ইহারা এই তৃতীয় স্তরের স্ত্রী-চরিত্র। এই চরিত্রগুলি মধ্যে কতকগুলি গৃহিণী কতকগুলি সন্ন্যাসিনী। কতকগুলি পতিযুক্তা—কতকগুলি পতিবিযুক্তা। গ্রন্থকার এই দুই শ্রেণীর রমণীর দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক শ্রেণীর ধর্ম্ম অপরের গ্রহণীয় নহে। সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইলেও তাহাতে অধিকারিভেদ আছে। ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি প্রফুল্ল ও শ্রী উভয় দ্বারা সন্ন্যাস আরম্ভ করাইয়া তাহার ফলাফল দেখাইয়াছেন। একজনকে তিনি সন্ন্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিয়া নিষ্কাম গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাইয়া চরিত্রের সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন—আমরা প্রফুল্ল চিত্তে প্রফুল্ল-চিত্রে শিক্ষার সুফলই দেখিলাম। অন্যটিকে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে চ্যুত করাইয়া অর্দ্ধেক গৃহস্থভাবে আনাইয়া সেই অবলম্বিত পথের দোষভাগ প্রদর্শন করিলেন—আমরা দুঃখিত চিত্তে শ্রীচরিত্রে সীতারামের অধঃপতনেরই কারণ দেখিলাম। পক্ষান্তরে নিশা ও জয়ন্তীর চিত্রে সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাও প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম।

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের পুরুষ-চরিত্র।

প্রথম স্তরের পুরুষ চরিত্রে আমরা যুবক জনের উচ্ছ্বসিত রমণী প্রেম দেখিতে পাই। গ্রন্থকার এই সকল চরিত্রের রমণী-প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে কোন আবিলতা থাকা প্রদর্শন করেন নাই। ফলতঃ সেই কামজ পদার্থটির সহিত এই যুগ্মের

অপরূপ সম্বন্ধ প্রতি তখন যেন গ্রন্থকারের বিশেষ দৃষ্টিই পতিত হয় নাই।

এই শ্রেণীর পুরুষচরিত্রগুলিকে পূর্ব্ববর্ণিত স্ত্রীচরিত্রের ন্যায় নিম্নোক্ত ভাগে বিভাগ করা যায়।

(১) যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রণয়পাত্র সমীপে প্রতিদানে ভালবাসা পাইয়াছেন এবং সেই পাত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত হইতে পারিয়াছেন।

যেমন, জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র; শচীন্দ্রনাথ।

(২) যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রণয়-পাত্র সমীপে প্রতিদানে ভালবাসা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইতে পারেন নাই।

যেমন, প্রতাপ, অমরনাথ, পশুপতি।*

(৩) যাঁহারা আদৌ প্রণয়-পাত্র হইতে প্রতিদানে সে প্রকার ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

যেমন, চন্দ্রশেখর, নবকুমার।

দ্বিতীয় স্তরের পুরুষ চরিত্র সৃষ্টিকালে প্রেমের সহিত কামের অপূর্ব্ব সম্বন্ধের প্রতি কবির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তখন তিনি দেখিলেন, যাহা দীপ্তিমান, তাহাই সুবর্ণ নহে। তখন তিনি কাম ও প্রেমের অপূর্ব্ব সংযোজন ও বিশ্লেষণ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল এই স্তরের প্রধান চিত্র।

দ্বিতীয় স্তরের পুরুষ চরিত্র শেষ করিয়া কবি দেখিলেন, প্রেমে

---

* পশুপতির বিবাহ হইয়া থাকিলেও মিলন হইতে পারে নাই।

যে কেবলমাত্র কামই দূষিত তাহা নহে, ইহাতে অন্য দূষণীয় পদার্থও আছে। তিনি দেখিলেন যে, রমণীজাতির সহিত পুরুষের অপরূপ সম্বন্ধ বশতঃ এই রমণীর প্রেম, কামজ হউক কি না হউক, বিবাহিতা পত্নী প্রতিই হউক, কি অন্যা স্ত্রী প্রতিই হউক, লোকের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-ক্ষমতার প্রতি বড়ই ক্রিয়া প্রকাশ করে। পুরুষের হৃদয়োপরি রমণী-প্রেমের এই অদ্ভুত আধিপত্য এই তৃতীয় স্তরের পুরুষ-চরিত্রের বর্ণিতব্য বিষয়।

জীবানন্দ, ভবানন্দ, ব্রজেশ্বর, সীতারাম, গঙ্গারাম প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর পুরুষ চরিত্র আছে, তাঁহারা এই সকল উপন্যাসে রমণী-সম্বন্ধ পরিশূন্য।

অভিরামস্বামী, মাধবাচার্য্য, অধিকারী, চন্দ্রশেখরের গুরু, রজনীর সন্ন্যাসী, সত্যানন্দ, সত্যানন্দের গুরু, ভবানী পাঠক, চন্দ্রচূড়, এই স্তরের চরিত্র। ইহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য অন্যত্র বলিতেছি।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে, ভবানী পাঠকের এই কথাটা পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। সেই দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, মৃণালিনীর মাধবাচার্য্য—কপালকুণ্ডলার অধিকারী, আনন্দমঠের সত্যানন্দ, দেবীচৌধুরাণীর ভবানী

পাঠক, সীতারামের চন্দ্রচূড়—ইঁহাদিগকে স্মরণ করুন। তার পরে আমাদিগের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিতেছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি ইহাতে একটা বিষয় দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইবেন। সে বিষয়টি, ভারতবাসীর উপর ব্রাহ্মণের আধিপত্য। সেই গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান, দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আধিপত্য। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজা সেই ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতেন—সেই ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজ্যধনজন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। বাহুবলে বলীয়ান্ ক্ষত্রিয়োপরি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ব্রাহ্মণের আধিপত্য রহস্যের বিষয় বটে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত বল কি—তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ রহস্য স্বতঃই ব্যাখ্যাত হইয়া পড়ে। শারীরিক বল যে মানুষের শ্রেষ্ঠ বল নহে, মানসিক বল বিদ্যাবুদ্ধিও যে মানুষের প্রকৃত বল নহে, তাহা এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই ব্রাহ্মণকুল অবশ্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদের এত বল জন্মিয়াছিল? তাহা নহে। তাঁহাদিগের প্রকৃত বল ছিল, ধর্ম্মবল; এবং এই ধর্ম্মবলই মানুষের সর্ব্বপ্রধান বল। এই বলেই ভারতের ব্রাহ্মণগণ—সেই স্বার্থত্যাগী পরোপকারব্রতে ব্রতী, সংসারে অনাসক্ত অথচ কর্ম্মবীর ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে এত প্রভাবশালী ছিলেন। যিনি শারীরিক বলের উপর নির্ভর করেন, সামান্য অস্থিমাংসনির্ম্মিত শরীর তাঁহার সহায়; যিনি বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের সান্ত ও ভ্রমসঙ্কুলবলাযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধিই একমাত্র সহায়; কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করেন, অসীম, অনন্ত ক্ষমতাশালী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরই

তাঁহাদের সহায়। কাজেই ধর্ম্মবলের প্রভাব অসীম। এই ধর্ম্মবলই ভারতের প্রকৃত বল ছিল—এই ধর্ম্মবলহীনতাই ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উত্থান ও পতনে ভারতের উত্থান ও পতন হইয়াছে, হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ কথা নিশ্চিত। আমাদিগের সূক্ষ্মদর্শী অতুল প্রতিভাশালী কবি, ইহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন —তাই তাঁহার গ্রন্থে দেশোদ্ধারের চেষ্টায় এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই ব্রতী দেখিতে পাই।

অভিরাম স্বামী, মাধবাচার্য্য, অধিকারী, সত্যানন্দ, চন্দ্রচূড় ও ভবানী পাঠক—ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে। যেমন গ্রন্থকারের ভালবাসা তত্ত্ব ক্রমে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছিল দেখাইয়াছি, তেমন ইহাদিগের চরিত্রেও সেইরূপ একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন কবি অভিরাম স্বামী চরিত্র চিত্রিত করেন,তখনই তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মর্য্যাদা, তাঁহাদিগের আধিপত্যরহস্য বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যেন তাঁহার সেই সময়ে ব্যভিচার দোষটার প্রতি তদৃশ ঘৃণা ছিল না। তিনি যেন মনে করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মূল শক্তি ধর্ম্মে নহে—বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে। তাই আমরা ব্যভিচারী অভিরাম স্বামীকে অমন বলবান্ দেখিলাম। তবে অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে. কবি তাঁহাকে যুগপৎ ব্যভিচাররত এবং ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত করিয়া দেখান নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, ব্যভিচার তাঁহার পূর্ব্বজীবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তা' হউক, তবু যেন আমাদিগের অবিশ্বাসী বুদ্ধিতে

এই মনে হয় যে, অভিরাম স্বামীর চিত্রে কবির ব্যভিচার-দোষটা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় স্থাপিত হইয়াছে।

অভিরাম স্বামী ক্রমে মাধবাচার্য্যে পরিণত হইলেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বদোষ ব্যভিচার দেখিলাম না—তাঁহার পূর্ব্ব গুণই সম্যক্ বিকশিত দেখিলাম। অভিরাম স্বামীর চিন্তা হইতে মাধবাচার্য্যের চিন্তা অধিকতর প্রসারিত হইল—মাধবাচার্য্য যবন-হস্ত হইতে হিন্দুরাজ্য উদ্ধার সঙ্কল্পে ব্রতী হইলেন। মাধবাচার্য্যই সাবেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত রূপে প্রথমে কবির গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইলেন।

পরে কপালকুণ্ডলায় এক অধিকারী দেখিলাম, তিনিও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বটেন, কিন্তু যেমন কপালকুণ্ডলার সহিত, প্রথম স্তরের অন্য উপন্যাস দুইখানির বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তেমনই এই অধিকারীর সহিতও অভিরাম স্বামী বা মাধবাচার্যের বেশী সম্বন্ধ দেখিলাম না। কাপালিকও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিন্তু তিনি ভিন্ন পথাবলম্বী—কবি এখানে এই ধর্ম্মাবলম্বীর ব্যভিচার দেখাইয়া গিয়াছেন। পরে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিতে পাইলাম না। কবি তখন যাহা দেখাইতে ব্যস্ত, তাহা দেখাইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আবশ্যক হইল না। রজনীতে একবার একটা লোককে দেখি-লাম, কিন্তু সে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নহে, সন্ন্যাসীমাত্র।

তাহার পরে যেমন কবির চিন্তার বিষয় সামান্য ভালবাসা হইতে সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্যে প্রসারিত হইল—তেমন মাধবা-চার্য্য সত্যানন্দে পরিণত হইলেন। সত্যানন্দ তখন চাণক্য-রূপী—মাধবাচার্য্যের ন্যায় তিনি হেমচন্দ্রের মুখাপেক্ষী নহে, তিনি স্বয়ং সাধক, স্বয়ং ব্রতী। সে কথা আমরা স্থানান্তরে বুঝাইয়াছি। সেই সত্যানন্দই আমাদিগের বিবেচনায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চরম

বিকাশ। সত্যানন্দের পরে দেখিলাম—ভবানী পাঠককে যেমন সত্যানন্দের সাধনা, ভবানীরও প্রায় তেমনই সাধনা। তবে সত্যানন্দের ভক্তির বিকাশ যত বেশী হইয়া ছিল, ভবানীপাঠকে আমরা ভক্তির তত বিকাশ দেখি নাই—দেখিয়াছি জ্ঞানের বিকাশ। চন্দ্রচূড় ও মাধবাচার্য প্রায় এক শ্রেণীর চরিত্র। তবে চন্দ্রচূড় কিছু অপেক্ষাকৃত আধুনিক রকমের—মাধবাচার্য্য হইতে যেন কিছু উন্নত।

এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও কবির উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধ মহাপুরুষ। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের গুরু। যথা চন্দ্রশেখরের গুরু ও সত্যানন্দের গুরু ইত্যাদি।

এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত চরিত্র ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

কবির জীবনচরিত।

আমাদিগের বোধ হয়, মহাকবির ঘটনামূলক কোন জীবনচরিত থাকা উচিত নহে। নেপোলিয়নের ন্যায় যুদ্ধবীরের জীবনচরিত লিখিতে তাঁহার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা একান্ত আবশ্যক; বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত লিখিতে হইলে, তাঁহার দয়ার কার্য্য, দেশহিতকরকার্য্য গুলির সমালোচনা একান্ত আবশ্যক; সেইরূপ কবির জীবনী লিখিতে হইলে, তাঁহার কাব্যের সমালোচনাই প্রধানতঃ আবশ্যক। প্রকৃত কবির জীবনী সেই কার্য্যেই থাকে। তাঁহার লিখিত কাব্য বা উপন্যাস হইতেই তাহা বাছিয়া লইতে হয়। সেই জীবনী ব্যতীত বাকী

যে টুকু সচরাচর জীবনীতে লিখিত হয়, তাহা সেই মানুষটার জীবনী হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনী নহে। রাম, শ্যাম, যদু, মধুর জীবনীও যেমন, উপন্যাসাদিতে প্রতিফলিত কবির জীবনী ছাড়া সেই কবি বলিয়া খ্যাত মানুষটির জীবনীও তেমন। আমরা তাহাতে কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই না। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির আমাদের এই মহাকবির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্তি হয়, সময় হয়, অর্থ হয় এবং ক্ষমতা হয়, তবে তিনি যেন রাম, শ্যাম, যদু, মধুর জীবনচরিতের ন্যায় বাহিরের ঘটনা দ্বারা সে জীবনী পরিপূর্ণ না করেন। সেক্সপিয়রের প্রকৃত জীবনচরিত দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, তাহা আরও দুষ্প্রাপ্য হইলে জগতের বেশী উপকার হইত। সেক্সপিয়রের গ্রন্থে তাঁহার যে জীবনচরিত আছে, তাহাই আমাদিগের বিশেষ আলোচ্য; তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্যের—আহার-বিহার প্রভৃতির ইতিহাস জানিলে লাভ কি? লাভ ত নাই—বরং ক্ষতি আছে। আমরা দুর্ব্বল মানব—আমরা বরং বাহিরের আচরণ দেখিয়া অভ্যন্তর অনুমান করিতে গিয়া ভ্রান্তিজালেই পতিত হইতে পারি। তবে এমন যদি কোন মহাপুরুষ থাকেন, সাহসে নির্ভর করিয়া যিনি সেই বাহিরের আচরণেও অভ্যন্তরস্থ পদার্থের প্রতিকৃতি দেখাইতে পারেন, সামান্য তাসখেলা হইতেও দর্শনতত্ত্ব উদ্ভেদ করিয়া দেখাইতে পারেন, তবে তিনি এ চেষ্টা করুন, ক্ষতি নাই। নতুবা সেক্সপিয়রের ফলাপহরণ কাহিনী পাঠকবর্গকে বলিয়া কবির এবং সেই লেখকের নিজের কলঙ্ক করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

বিদায়।

মহাকবি! তবে বিদায় হই। এই কয়েক বৎসর তোমাকে ভাবিয়া, তোমাকে দেখিয়া, তোমার পুস্তক পড়িয়া, যে কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা তোমারই ন্যায় না হইলে বলিতে পারিতেছি না। আমার সমস্তই তুমি। আমার জ্ঞান বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা সকলই তোমা হইতে। এ জনমে তোমারই উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু পড়িতে পারিলাম না। আমার সেক্সপিয়রও তুমি, কালিদাসও তুমি। আমার সাংখ্যও তুমি, পাতঞ্জলও তুমি; আমার উপনিষদও তুমি, গীতাও তুমি। আমি তোমার উপন্যাস পাঠে যে সুখলাভ করিয়াছি, এমন সুখ দাম্পত্যপ্রণয়ে উপভোগ করি নাই—আমি তোমার উপন্যাস পড়িয়া যে উপদেশ পাইয়াছি, এমন উপদেশ কোন গুরুর নিকটেও পাই নাই। শুধুই কি ইহাই? তাহা নহে। যখন বসন্ত-প্রভাতে মৃদুমন্দ সমীরণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করে, তখন তোমাকেই যেন তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। যখন কাননমধ্যস্থ বৃক্ষপল্লবপরিব্রত কোকিল-কূজন হৃদয়টাকে বিশ্লেষণ করিয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত করে, তখন তোমাকেই তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। যখন স্নেহভাজন তনয়াগণ সম্মুখে আসিয়া হৃদয়ে স্নেহরাশি উদ্বেলিত করে, তখন তোমাকেই তাহার মধ্যে দেখিতে পাই—যখন ভক্তিভাজন জনক জননীর অপত্যস্নেহ দেখিয়া হৃদয় ভক্তিবিহ্বল হইয়া পড়ে, তখন তোমাকেই তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। তোমার উপন্যাসের ন্যায় আমার এমন সুখের, এমন শিক্ষার, এমন হাসির এমন কান্নার সামগ্রী এ জনমে আর কিছুই হইতে পারিল না।

তবে যাও মহাকবি, তোমার সেই অনন্তধামে। অনন্তধামে সেই বৃহত্তর, বৃহত্তমে মিশাইয়া যাও—সেই বিশালতর বিশালতমে মহত্তর, মহত্তমে মিশাইয়া যাও—সেই গুরুতর গুরুতমে, প্রিয়তর প্রিয়তমে মিশাইয়া যাও। আমরা ব্যষ্টি ভাবেই তোমাকে এতদিন দেখিয়াছি, এখন সমষ্টিরূপে দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

তবে তোমরাও বিদায় হও, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা চন্দ্রশেখর—কৃষ্ণকান্তের উইল—রজনী রাজসিংহ—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী সীতারাম—তোমাদিগের নিকটেও বিদায় লইতেছি। তোমরা যে প্রভুর পালিত, যাঁহার আশ্রিত, যাঁহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তাঁহার সিংহাসন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর। যদি কোন ভোজরাজ পাত্রমিত্রসহ ইহাতে উপবেশন করিতে আগমন করেন, তবে এক এক করিয়া তোমরা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিও—তাহা হইলেই কেহ এ সিংহাসন অধিকার করিতে সাহস করিবে না। তবে ব্যক্তিবিশেষকে দয়া করিয়া এ সিংহাসনে উঠিতে নিষেধ করিও না। কারণ সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যে অনেকেরই বিশেষ আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা ইহাই আমার শেষ নিবেদন।

সমাপ্ত

মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে কলিকাতার প্রধান২ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ১ম ভাগ (দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।) ১।০*

—২য় ভাগ শেষার্দ্ধ (কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখরের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।) ১।০‡

গৃহলক্ষ্মী ১ম ভাগ (স্বামী ও স্ত্রীর সরস কথোপকথনচ্ছলে নীতিগর্ভ উপদেশাবলী—উত্তম বাঁধাই।) ৸০

—২য় ভাগ উত্তম বাঁধাই ৸০

দম্পতীর পত্রালাপ (স্বামী স্ত্রীর পত্রালাপচ্ছলে স্ত্রীজাতির অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপদেশ) উত্তম বাঁধাই ৸০

হিতকথা (স্কুলের ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধ-পুস্তক) ।৵০

সংক্ষিপ্ত জমিদারী প্রবেশ ৵০

---

* বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা গুরুদাস বাবু এই গ্রন্থের প্রকাশক। তিনি কখনও অর্দ্ধমূল্যে কখনও সিকিমূল্যে ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন।

‡ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বসু বি, এ এই গ্রন্থের প্রকাশক। তিনি সম্প্রতি অর্দ্ধমূল্যে ।৵০য় ইহা বিক্রয় করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মহাকবি ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত তাঁহার পত্রেই প্রকাশিত আছে। সে পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গৃহলক্ষ্মী ও দম্পতীর পত্রালাপের প্রশংসাপত্র মুদ্রিত করিবার আবশ্যকতা নাই।

বঙ্কিম বাবুর পত্র।

"সাদর সম্ভাষণম্—

"আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা, যে আমার প্রণীত নরনারী-চরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ।

"তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।

"আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিবেন তাহা করিবেন। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

"আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার বিচারশক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি।"